বহিবাসর

প্রমেন্দ্র মিত্র

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৭২
জুলাই, ১৯৬৫

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
সুধীরকুমার ঘোষ
পদ্মশ্রী আর্ট প্রেস
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
অরুণ বণিক

বহ্নিবাসর

এই লেখকের

মৌসুমী

দূর বসন্ত

স্তব্ধপ্রহর

মনুষ্যাদশ

এলো অচেনা

সাগর থেকে ফেরা

হৃদয় দিয়ে গড়া

॥ এক ॥

ওদের বাবা মারা যাবার সময় জয়ন্ত আর তার বোন খুশি নেহাৎ
াট। মা মারা গিয়েছিলেন আগেই। কাজেই, ওদের মানুষ
রেছেন ওদের একমাত্র কাকা রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ। তখন
বশ্য ভবানীপ্রসাদ শুধু ভবানীপ্রসাদ, রায়বাহাদুর হন নি। অকৃতদার.
ঃসন্তান ভবানীপ্রসাদের কাছে ওরা সেদিন থেকে নিজের সন্তানেরই
ত মানুষ হয়েছে। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ঘন-
াধার বনে সন্ধানী আলোর মত একরোখা আর তীক্ষ্ণ, প্রদীপের
ালোর মত মৃদু-কম্প নয়। এরা জানে লক্ষ্য বস্তুকে চিনে নিতে, দ
ার সদ্ব্যবহার করে নিতে। ভবানীপ্রসাদ এই শ্রেণীরই।

জলে জল বাঁধে। টাকা দিয়ে টাকা বেঁধেছেন ভবানীপ্রসাদ—
ংশগত কিছু সম্পত্তি ছিল। কিছু টাকা আর বসতবাড়ি। টাকএর
াটিয়ে এবং তার থেকেও অনেক বেশী মাথা খাটিয়ে ভবানীপ্রসাদ
াজকাল এ-অঞ্চলের বড় কণ্ট্রাক্টর হয়ে উঠেছেন। তার ওপরটা
য়ন্তর বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তি সবটা দেখাশোনা
রবার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর ওপর। খুব বেশী অসুবিধে হয় নি
বাকাসাদের। কিন্তু জয়ন্তের বাবার মৃত্যু বড় এক আশ্চর্য মৃত্যু।
থাথা তাসে ন প্রথমে [illegible] পরিবর্তন নি এটা অনায়াস স্বাভাবিক
তু বোঝা যায় না ওপর থেকে। নীচের জলের টান নীচে গেলে
বোঝা যায় ঠিক। কিন্তু যেদিন নবাঙ্কুর কাগজে ড্রামণ্ডকে আক্রমণ
করে বিরাট সম্পাদকীয় বেরুলো সেদিন আর মাথার ঠিক রাখতে
পারলেন না তিনি—রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ!

কাগজটা হাতে করেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ভবানীপ্রসাদ, জয়ন্তকে
ধরবার জন্যে। ইচ্ছে ছিল এ কথাটা আজ ভাল করেই বুঝিয়ে দেবেন

দল গড়ে ওদের মফস্বল শহরে। সে দল কতটা কি করতে পারবে সে বিষয়ে ভাববার আছে বটে। কিন্তু কিছু একটা করবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই জয়ন্তর। সন্দেহ নেই বটে তবে দায়িত্ব আছে ওর। বিঘ্নসংকুল পথে চলবার, আরও অনেককে পথ দেখিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব বড় কম নয়। পথে আছে সঙ্ঘর্ষ। সঙ্ঘর্ষ আছে নিজের পরিবেশের সঙ্গে। সঙ্ঘর্ষ আছে জয়ন্তর সঙ্গে ভবানীপ্রসাদের। স্নেহের বর্ম ভেদ করে মাঝে মাঝে সে সঙ্ঘর্ষের আঘাতচিহ্ন স্পষ্ট রেখাপাত করে।

এমনই করে কেটে গেছে কয়েক বছর। এসেছে যুদ্ধ। যত-না মানুষ মারার, তার থেকে বেশী করে মনুষ্যত্বকে হত্যা করার অপূর্ব [illegible] আবিষ্কৃত হয়েছে—শুরু হয়েছে মহাযুদ্ধ। তার ঢেউ এসে লেগেছে [illegible] দেশে। লেগেছে এই অবহেলিত মফস্বল শহরে। যে শহরে [illegible] বহু সম্পদের এক কণাও এসে পৌঁছয় না সহজে, সেই গ্রামে, [illegible] শহরে আজ মহাযুদ্ধের অভিশাপের ঢেউ এসে লেগেছে। আসছে [illegible], আসছে রণসম্ভার, রসদ। তাদের ছাউনি চাই, গুদাম চাই [illegible] এখানে মাটি কেটে পথ হবে, নদীর ওপর হবে পোল, ওখানে [illegible]-বাদাড় সাফ করে হবে এরোড্রাম ঘাঁটি। কাজ আর কাজ। শেষ নেই, অন্ত নেই। সারা দিন, সারা রাত খেটেও শেষ করতে পারছে না ভবানীপ্রসাদ। কণ্ট্রাক্টের পর কণ্ট্রাক্ট! নতুন ডিস্ট্রিক্ট কন্‌ট্রোলার এসেছেন এখানে। খাস বিলেত থেকে নতুন [illegible] মিঃ ড্রাম্ব [illegible] ভবা[illegible]

কবার এসেছিলেন ভবানীপ্রসাদের বাড়িতে। সেদিন সাবেকী আমলের সব দেওয়াল-সজ্জা বার করা হয়েছিল। ফিতে আর ফুল। লেখা আর আঁকা। ড্রইংরুম···ডাইনিং রুম····কোথাও কোন ত্রুটি নেই দিশি আবহাওয়াকে মুছে ফেলবার, ভোলবার! আবার সঙ্ঘর্ষ হয়েছে জয়ন্তর সঙ্গে। জয়ন্ত বারবার আপত্তি জানিয়েছে কাকাবাবুকে। এই কণ্ট্রাক্টরি ব্রিটিশসাম্রাজ্য রক্ষার হাতিয়ার বানানোর কাজ—এই সমর-আয়োজনের প্রস্তুতি, এ যে দেশের শত্রুতা সাধন। কিন্তু, ভবানীপ্রসাদের মন এতে ভোলে নি। ব্রিটিশের সাম্রাজ্য রইল কি গেল তাতে তার কিছু যায় আসে না। তবে এই কালোবাজারে যারা সুযোগ করে নিতে পারছে তাদেরই ঘরে যখন কিছু আসছে, তবে সন্ধানী ভবানীপ্রসাদের ঘরে কিছু আসবে না কেন। এই বাড়ি প্রাসাদ হবে না কেন? ভবানীপ্রসাদ রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ হবেন না কেন?

এ কেন'র আর জবাব নেই। জবাব দেবার অবসর নেই—জয়ন্তরও রয়েছে অনেক কাজ। এসে গেছে জন-গণ-মথিত ১৯৪২এর অগস্ট!···এসে গেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। কেবল কাজ আর কাজ। বিশেষ করে আজকাল একটা নতুন কাজ হাতে নিয়েছে সে। একটা নতুন কাগজ বার করছে মাসে মাসে। নাম 'নবাঙ্কুর'। অতীতের উত্তরাধিকার-সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের বীজ একটি। নবাঙ্কুরের সম্পাদক প্রকাশক, মুদ্রাকর একাধারে সবই ঐ জয়ন্ত। ভবানীপ্রসাদ এ বিষয়ে মাথা ঘামান নি প্রথমে। গ্রাহ্য করেন নি একে। কিন্তু ফল্গু স্রোতকে বোঝা যায় না ওপর থেকে। নীচের জলের টান নীচে নামলেই বোঝা যায় ঠিক। কিন্তু যেদিন নবাঙ্কুর কাগজে ড্রামণ্ডকে আক্রমণ করে বিরাট সম্পাদকীয় বেরুলো সেদিন আর মাথার ঠিক রাখতে পারলেন না তিনি—রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ!

কাগজটা হাতে করেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ভবানীপ্রসাদ, জয়ন্তকে ধরবার জন্যে। ইচ্ছে ছিল এ কথাটা আজ ভাল করেই বুঝিয়ে দেবেন

যে স্পর্ধার একটা সীমা থাকা দরকার। অনেক উপদ্রব সহ্য করেছে তিনি, স্নেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন এতদিন, কিন্তু শাসনেরও প্রয়োজন যে আছে, এবং সে শাসনের পথও যে তাঁর জানা আছে ভালমত, সেই কথাটাই আজ মনে করিয়ে দেবেন।

জয়ন্ত—জয়ন্ত—ডাকছেন আর এঘর ওঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। চাকরবাকরেরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে হটে। রায়বাহাদুরের হাতের মধ্যে কাগজটা যেন জ্বলছে, হাতের মুঠির মধ্যে তার আঁচ যেন বোধ করা যায়! অসহ্য! সিঁড়ির ধারে খুশির সঙ্গে দেখা। রায়বাহাদুর বলেন, কোথায় গেল সে হতভাগা?

—দাদাকে খুঁজছ কাকাবাবু? দাদা ত বাইরের ঘরে।

—বাইরের ঘরে, আচ্ছা আমি দেখছি।

বাইরের ঘরের একপাশে খানিকটা জমি। সে জমিতে একটা টিনের চালা মত আছে। দেওয়ালগুলো আধভাঙা। কবে যেন গুদাম করেছিলেন রায়বাহাদুরের পূর্বপুরুষ। প্রয়োজন ফুরোবার পর আর হাত পড়ে নি। পড়ে আছে পড়ো-পড়ো ঘরটা। সেইখানেই পাওয়া গেল জয়ন্তকে। সঙ্গে একজন ভদ্রলোক। গম্ভীরভাবে কি যেন আলাপ হচ্ছে ওদের দুজনের মধ্যে। জয়ন্ত বলছিল, আর এই দেওয়ালটা ভেঙে ফেলতে হবে বুঝেছেন! কথাটা কানে গেলেও বুঝতে পারলেন না রায়বাহাদুর। হাঁক দিলেন, জয়ন্ত।

—কি কাকাবাবু! একবার তাকিয়ে নিল জয়ন্ত কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর মুখে রাগের আগুন। হাতের মুঠো দিয়ে নবাঙ্কুর উঁকি দিচ্ছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে দেরি হল না জয়ন্তর, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের মত গাম্ভীর্য নিয়ে বলে চলল দ্বিতীয় ভদ্র লোকটিকে—হ্যাঁ আর দেখুন, এ দেওয়ালেও দুটো দরজা করতে হবে।

রায়বাহাদুরও নিজের কথা বলতে শুরু করছিলেন—এই কাগজে—

কিন্তু জয়ন্তর গলা শুনে থেমে গেলেন চকিতে। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে কাঁপিয়ে তুললেন—জয়ন্ত—শুনতে পাচ্ছো!

—শুনতে পাচ্ছি। অম্লান বদনে সাড়া দিল জয়ন্ত।

আবার শুরু করছিলেন রায়বাহাদুর—এই কাগজে—

জয়ন্ত ততক্ষণে সেই ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে গেছে আর এক দিকে। একটুও যেন কথা বলবার সময় নেই জয়ন্তর। কাজ আর কাজ কেবল। জয়ন্ত বলছে, এদিকের দেওয়ালটা—এইটাই বা রাখবার দরকার কি?

ভদ্রলোক রায়বাহাদুরের মুখের দিকে দেখছেন আর 'হ্যাঁ' 'না' করে যাচ্ছেন। এবার কিন্তু রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

জয়ন্তর কথাটা শুনে রায়বাহাদুর এগিয়ে এলেন জবাব দিতে—না তা রাখবার দরকার কি! সমস্ত বাড়িটা ভেঙে ধ্বসিয়ে দিলেই ত হয়। কিন্তু কি ব্যাপারটা জানতে পারি?

হাসিমুখে জবাব দিলে জয়ন্ত, সে কি! আপনি এখনও জানেন না? এখানে যে প্রেস করবো ঠিক করেছি। আমাদের কাগজ-ম্ 'নবাঙ্কুর' এখানেই ছাপা হবে।

হাতের মুঠোর মধ্যে কাগজটা আর একবার চটকে নিলেন রায়বাহাদুর। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, এখানেই ছাপা হবে! তার চেয়ে বল না এখানে আমার শ্রাদ্ধ হবে, আমার পিণ্ডি হবে! আমার ভিটেতে তুমি ঘুঘু চরাবে!

জয়ন্তর মুখের হাসি তখনও মিলোয় নি। সে বলে, আপনি যেন রাগ করছেন মনে হচ্ছে কাকাবাবু।

এখনও মনে হচ্ছে।—রেগে গিয়ে কি করবেন ঠিক যেন বুঝতে পারেন না রায়বাহাদুর।—এখনও বুঝতে পারছ না আমি ক্ষেপে গেছি···আমার মাথায় আগুন জ্বলছে?

—কেন কাকাবাবু?

—কেন? হাতের মুঠো থেকে পাকানো কাগজটা মেলে ধরে বলেন তিনি—কি লিখেছ এ কাগজে ড্রামণ্ড সাহেবের বিরুদ্ধে?

—বেশি কিছু ত লিখি নি, লিখেছি যে তার মত অক্ষম অপদার্থ খোশামোদপ্রিয়, ঘুষখোর অত্যাচারী অফিসারকে এ সাবডিভিসন থেকে কান ধরে এখুনি বের করে দেওয়া দরকার।

—ও, কিছুই এমন লেখ নি, কেমন? কিন্তু জানো, তোমার ওই লেখার জন্যে কি হয়েছে? জানো আমার সমস্ত টেণ্ডার এবার রিফিউজড্ হয়েছে, জানো এতদিনের কনট্রাক্টরির কারবার আমার ডুবতে বসেছে?

—ঘুষ আর খোশামোদের ওপর যার ভরসা, সেরকম চোরাকারবার ডুবে যাওয়াই ভাল। বলতে বলতে হঠাৎ জয়ন্তর মুখের হাসি গেল মিলিয়ে, স্বর হল কঠিন।

—বটে, এত বড় কথা! আমি চোরাকারবার করি! যাও, বেরিয়ে যাও এখনি এ বাড়ি থেকে। এই কারবার না করলে কোথায় থাকতে তোমরা হতভাগা? আজ বড় স্বদেশী হয়েছ, না? আমার মত এই স্বদেশী হুজুগ করে আর জেল খেটে দাদা নিজেও মরেছে, যথা সর্বস্ব খুইয়ে, বংশটারও সর্বনাশ করে গেছে, তা জানো? কে সে-সব উদ্ধার করেছে? দুটো অপগণ্ড বাচ্ছা রেখে দু'জনে যখন মরে পড়ল তখন কে তোমাদের মানুষ করেছে? ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকেন রায়বাহাদুর।

একটু থেমে জয়ন্ত বলে, এতদিন যদি মানুষ করে থাকেন, তাহলে আজ সত্যিকার মানুষ হতে কেন বাধা দিচ্ছেন কাকাবাবু!

—ও, আমারই সর্বনাশ করবার নাম তোমার সত্যিকার মানুষ হওয়া, না? আমার বাড়ি ভেঙে তুমি প্রেস করবে! আমার [illegible] ভরসা তাদের নামে কাগজে গালাগালি দিয়ে আমার [illegible] লাল-বাতি জ্বালাবে! আর আমি তাই সহ্য করবো

—একটু থামেন রায়বাহাদুর। তারপর গলাটা আর এক

সেই ভদ্রলোককেও শুনিয়ে বলে উঠেন কঠিন স্বরে—এসব কিছু এখানে চলবে না। এখানে থাকতে হলে ও-সব প্রেস, কাগজ, লেখা সব ছাড়তে হবে!

—তাহলে এখানে না থাকাই আমার ভাল কাকাবাবু!

—না থাকাই ভাল. নিজের কথায় নিজেই যেন চমকে ওঠেন রায়বাহাদুর!—তার মানে তুমি এখান থেকে চলে যাবে!

—না গিয়ে কি করি বলুন! বাবার আদর্শের কথা ত ভুলতে পারবো না: প্রেস, কাগজ, লেখা এসব ছাড়তে পারবো না আপনি ত আর ও-সব এখানে করতে দেবেন না!

—না না, ওসব বাঁদরামি এখানে চলবে না।

—বেশ, তাহলে চলে যাচ্ছি! খুশি··খুশি। ডাকতে ডাকতে জয়ন্ত বাড়ির ভেতর দিকে এগিয়ে চলে।

—খুশি, খুশিকে আবার কেন?

—বাঃ, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ত! সে ত আমারই ছোট বোন। আমি ছাড়া আর ত তার কেউ নেই।

—আর তার কেউ নেই! একাধারে বাপ-মা হয়ে, বাপ-মা মরা ছেলে মেয়েকে মানুষ করে তুলেছিল কে! কে এতদিন ধরে তার সব দায় সব ঝক্কি নিয়েছে? তুমি?

ডাক শুনে খুশি এসে গেছে ততক্ষণে। ভয়-চকিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

জয়ন্ত বলেছে জবাবে, না আপনিই নিয়েছেন। তার জন্যে আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। সমস্ত স্নেহের আবরণ ভেদ করে আজ আঘাত দিয়ে চলেছে জয়ন্ত—কিন্তু তবু, আমি যখন তার দাদা, আমার সঙ্গেই তাকে নিয়ে যাবো। তা ছাড়া এ বাড়িতে আর থাকাও উচিত নয়।

—কেন, কেন উচিত নয় শুনি? পরাজিতের স্বরে যেন প্রশ্ন করেন রায়বাহাদুর।

—যে আদর্শের জন্যে বাবা জীবন দিয়েছেন তারই যেখানে অপমান হয়, সেখানে আর কি করে খুশিকে রাখতে পারি ?

—ওঃ, এত বড় কথা! বেশ এখুনি দুজনে বিদায় হও এখান থেকে—এক্ষুনি···

জয়ন্ত খুশির হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল, কাকাবাবুর আবার কথা শোনা গেল। বলি, যাচ্ছ ত, খাবে কি ?

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে বললে, আমার নিজের ত হাজার কয়েক টাকা আছে, তাছাড়া যাহোক একটা চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে।

—কিন্তু, থাকবে কোন্ চুলোয় শুনি ?

—ভাবছি কলকাতার বাড়িতেই গিয়ে উঠবো—সেটা ত বাবারই ছিল!

—হ্যাঁ ছিল ত একটা ভাঙা পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ি। নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে সে বাড়ি আমি মেরামত করেছি জানো? জানো মাসে চারশ' টাকায় সেটা ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে!

—নিজেদের থাকার যখন জায়গা নেই তখন সে ব্যবস্থা বদলে দিতে হবে! আর মেরামত যদি করে থাকেন সে আপনার নিজের দোষ। ইচ্ছে করলে আপনি আবার ভেঙে দিতে পারেন।

বেশ যেন একটা আলাদা হওয়ার দূরত্ব নিয়ে বলতে থাকে জয়ন্ত।

—ওঃ ভেঙে দিতে পারি!—জয়ন্তর কথাটা পুনরাবৃত্তি করে যেন তিনি আবার শুনতে চান কথাটা!—অ্যাঁ? মনের ভেতরটা চমকে ওঠে রায়বাহাদুরের। নিষ্ফল রাগে বলে ওঠেন, দূর হও, দূর হও আমার সামনে থেকে। তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার!

জয়ন্ত নীরবেই মেনে নিয়েছিল এই আদেশ। কিন্তু ছোট্ট খুশি কেঁদে ফেলে কাকাবাবুর রাগ দেখে। ভাঙা গলায় ডাকে একবার, কাকাবাবু!

—না না, আমি তোর কাকাবাবু নই। খুশির দিকে অভিমানে সজল চোখদুটো না ফিরিয়েই বলে চললেন রায়বাহাদুর—তোর

স্বদেশী বাপের আমি কুলাঙ্গার ভাই! ওই স্বদেশী দাদার সঙ্গে তুই বিদায় হ'—আমার আপদ যাক্!

কথাটা শেষ করেই, নিজেই যেন বিদায় হলেন এমনভাবে হন্ হন্ করে চলে গেলেন রায়বাহাদুর ওদের সামনে থেকে।

খুশির মুখ দুঃখে আর কান্নায় কালো হয়ে আসে।

জয়ন্ত হঠাৎ মুখ টিপে একটু হেসে নেয়। তারপরই কঠিন হয়ে ওঠে ওর মুখ। খুশির হাতটা ধরে টান দিয়ে বলে, আয় খুশি।

খুশি যায় না—যেতে হয় তাকে।

॥ দুই ॥

কলকাতার পথ। পথের ধারে জয়ন্তর বাবার পুরোনো বাড়ি। বহুকাল আগেকার বাড়ি—তার ওপর আধুনিক রুচির সাময়িক তাগিদের জরুরি সংস্কারের ছাপ। দেখে মনে হয়, কালো মেয়ের মুখে যথেষ্ট পাউডার ক্রীমের প্রলেপ পড়েছে।...সরু গলির ওপর এই বাড়ি। বাড়ির পাশ দিয়ে একটা ততোধিক সরু কানা গলি চলে গিয়েছে। বাড়ির মধ্যে একটা ঠাণ্ডা আবহাওয়া আশা করা যায়—একটা স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা হাওয়া। কিন্তু ঠিক তা নয়। সংস্কারের ফলে আর কিছুই না হোক এই আবহাওয়াটা দূর হয়েছে কাঁচা চুন আর বালির গন্ধে। রায়বাহাদুরের গর্বটা ছিল বোধ হয় এখানেই। অতকালের পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়িটার ভোল বদলে এমন করে তুলেছেন যে এ বাজারে তিনসংখ্যার বেশ উঁচু হারেই তা ভাড়া হয়ে যাবে। জয়ন্তর সঙ্গে সেদিনকার তর্কে তাই রায়বাহাদুর সে কথাটার উল্লেখ করে এই গর্বটুকু আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।

রায়বাহাদুরের আশা দুরাশা নয়; বাড়ির পিছনের ইতিহাস যা-ই হোক তার এই প্রলেপ ধরানো রূপ দেখেই এসেছেন নটবর

পাল। মাথার গোল টাকের মরুভূমি আর কালো বার্নিশ করা মেদবহুল দেহ। গ্রামের মানুষ, কিছু কারবার আর ক্ষেতখামার ছিল। যুদ্ধের বাজারে, বর্ষাব জল পেয়ে হঠাৎ বান-ডাকা প্রগলভা নদীর মত কারবারটা তাঁর দুকূল ছাপিয়ে ফুলে উঠেছে বেশ। দেশের ক্ষেতখামারের প্রয়োজন বোধ হয় ফুরিয়েছে; তাই কলকাতার দিকে তাঁর এই নতুন নজর।

নটবর বাড়ির খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন নিজের চোখে। সঙ্গে এসেছেন ওঁদেরই গ্রামের দুলাল সামন্ত।

বাড়ির সরকার নটবরবাবুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল বাড়িটা। মোটামুটি মনে ধরেছে নটবরবাবুব। এমন কাঁচা চুন আর বালির গন্ধ মনে ধরা বিচিত্র নয়। নটবরবাবু দুলালকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তা বাড়িটা নেহাৎ মন্দ নয়। কি বল হে দুলাল? ঘরগুলো বেশ ডাগর ডাগর বানাইছে, দরজাগুলো খুব লম্বা চওড়া ‹টেক্। তবে সিঁড়িটা মিছামিছি এতটা জায়গা লিছে!

আর যাই হোক নটবর পাল তাঁর গ্রাম্য ভাষা, চালচলন কিছুই ত্যাগ করতে পারে নি। ত্যাগ করবার প্রয়োজন হয় নি তাঁর।

দুলাল নটবর পালের কথায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, আজ্ঞে যা বলেছেন। সিঁড়িটা বেফজুল জায়গা নষ্ট।

সিঁড়িটা বোধ হয় বড়ই সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে এটাও তার আগে স্বীকার করে নিতে হয় যে নটবর পাল আর দুলাল এদের কারুরই গ্রামের বাড়িতে সিঁড়ির কোন ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজন নেই বলে।

বাড়ির সরকার যেমন বলতে হয়, গুছিয়ে বলতে চায়।—আজ্ঞে যেমন বাড়ি তেমন সিঁড়ি ত হবে, মানানসই হওয়া চাই। একাধারে সিঁড়ি আর বাড়ির দর বাড়াতে চায় সরকার।

—রাখো তোমার মানানসই! নটবর পাল তবু কড়া করে শোনাতে চান—সিঁড়ি ত আর ঘর লয় হে, যে হাত পা মেলে শুয়ে

থাকবে। শুধু উঠবে আর নামবে, তার আবার অত বাহার কিসের?

—একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। সিঁড়ি ত শুধু উঠবে আর নামবে তা চওড়া হলেই বা কি আর সরু হলেই বা কি! আপনার মত বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকলে কি আর এরকম সিঁড়ি বানায়! দুলাল হৈ-হৈ করে কথাগুলো বলে সরকারের মুখ বন্ধ করে দিতে চায়।

—আজ্ঞে সিঁড়ি ত আর এখন বদলানো যাবে না, তবে বাড়িটা মোটামুটি যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভাড়ার ব্যবস্থাটা—। এই সুযোগে ব্যাপারটা পাকাপাকি করে নিতে চায় সরকার। সিঁড়ি সম্বন্ধে খুঁতখুঁতুনিটা শিকড় গেড়ে বসতে না দেওয়াই ভাল ওদের মনে।

—ভাড়ার কথা ভাববেন না মশাই ভাড়ার কথা ভাববেন না। আমাদের পাল মশাইয়ের যদি পছন্দ হয়ে যায় তবে ভাড়া কোন্ ছার, বাড়িটা কিনে নিতে পারেন এক্ষুণি। কি বলেন পাল মশাই—? পাল মশাইয়ের টাকার জোরের ইঙ্গিতটা সময় মত লাগাতে পেরে ধন্য হয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভেজাতে থাকে দুলাল। যেন তার স্বাদ-গ্রহণ করছে সে!

—উহুঃ। উ বাড়ি কেনা বেচার মধ্যে আমি নাই! গোটা দেশের মানুষের চোখে চোখে থাকবে এমন মাল কিনতে যাব কেন হে? আমায় বোকা পেয়েছ বটে। চোখে অভিজ্ঞতার বাঁকা আলো ঝলসায় নটবরবাবুর!

—আজ্ঞে যা বলেছেন। বুদ্ধিমান লোক কি কখনো এ বাজারে বাড়ি কেনে?—নটবর পালকে সমর্থন করতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না দুলালের।—বাড়ি ত আর কালোবাজারে বিক্রীর জিনিস লয়!—বিজ্ঞের হাসি হাসে দুলাল।

তারপর, একটু দম নিয়ে সরকারের দিকে তাকিয়ে বলে, পাল মশায়ের কি ব্যবসা বুদ্ধি দেখেছেন। এ বুদ্ধি না থাকলে আর এই বছরের ধুলো মুঠো সোনা মুঠো হয়ে ওঠে!

সরকার পাকা লোক। নেহাৎ ভালোমানুষের মতই মাথা নীচু করে পাকা কথা বলে, বাড়িটা পছন্দ হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু এখনো জানতে পারলুম না।

—আরে দাঁড়ান মশাই? কারবারি নটবর পাল ধমক মেরে ওঠে —পছন্দ অমনি এক কথায় হলেই হল। আমি পছন্দ হয়েছে বলে ফেলাই আর অমনি আপনি ভাড়াটা বাড়ায়ে দিয়ে বসুন। এ লটবরের কাছে সে চালাকিটি হবার জো লাই! আচ্ছা ওধারে ওটা কি বটে?

বাথরুমের দিকে ইঙ্গিত করেন বলে মনে হয়। সরকার শুধোয়, আজ্ঞে কোনটার কথা বলছেন?

—এই যে।

বাথরুমের দিকে ইঙ্গিতটা বটে।

চালাকি ধরে ফেলার হাসি হেসে বলেন নটবর, হেঁ হেঁ....এই ত ফাঁকির কারবার ধরে ফেলেছি!

—আজ্ঞে ফাঁকির কারবার? সরকার সত্যি সত্যিই চমকে ওঠে এবার। মোজাইক করা আধুনিক বাথরুমের মধ্যে ফাঁকি!

—ফাঁকি লয় ত এটা কি বটে! এই যে ভাল ভাল জেল্লাদার পাথরগুলা এইখানে লাগাইছেন—কই বাড়ির কুথাও ত ইগুলা লাই?

—মারবেল পাথরের কথা বলছেন? এগুলো যে শুধু বাথরুমেই থাকে।

—বাত হতে যাবে কেন? হঠাৎ বলে ওঠেন নটবর পাল।

বাথরুম সম্বন্ধে যার ধারনার দৌড় পুকুরপাড় আর কুয়াতলা পর্যন্ত তার কাছে এমন কথা নেহাৎ বিস্ময়কর না হলেও সরকার মনে মনে বিস্মিত হাসি হাসে। বলে, বাত নয় ··বাথরুম···মানে চানের ঘর।

—ইস্ আমাকে একেবারে জল বুঝাই দিলেন! গায়ে ঢাকা জোটে না পায়ে সোনার চুট্‌কি। চানের ঘরে পাথর দিয়ে করে হবে বটে? গোটা বাড়িটা এমন করে সাজাই দিতেন ত ভুক শুয়ে

বলতেন তাই দিয়ে দিতাম। তা ভাড়া কত বটে! খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে পাকা কথায় আসতে চান নটবর তাড়াতাড়ি।

—আজ্ঞে চারশো টাকা মাসে। যুদ্ধের বাজারের দর বলে সরকার।

—চারশো টাকা সে যে অনেক টাকা হে। চোখ দুটো গোল গোল করে কিছু সময় ভেবে দেখেন নটবর পাল; তারপর বলেন, তা চারশো টাকাই না হয় দিয়ে দিব—কি বল হে দুলাল ··চারশো টাকা শুনে নটবর পাল কি ডরায়ে যাবে নাকি?

—রামঃ রামঃ, চারশো টাকা আপনার কাছে তো হাতের ময়লা। হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে দুলাল, তাছাড়া কলকাতা শহরে থাকবেন আপনার উপযুক্ত একটা বাড়ি না হলে চলে। আপনি ত আর হেজিপেঁজি লোক নন।

—তাহলে পাকা কথা হয়ে গেল বটে। এখন শুধু টাকাটা দিয়ে রসিদটি লিখে দেবেন—চলেন।

মনে মনে রাজি হয়ে গেল সরকার। আর যাই হোক লোক চেনে সে! আর যাই হোক ভাড়ার টাকাটা আদায় হয়ে যাবে ঠিক। গণ্ডগোল বিশেষ হবে না বলেই মনে হয়। অন্ততঃ এ মাসেরটা ত আগাম পাওয়া যাচ্ছে। কম নয় চার চারশো টাকা। নেহাৎ যুদ্ধের বাজার বলেই—তা নইলে এ বাড়ির ভাড়া কি আর—

সরকার বলে, চলুন নীচে যাওয়া যাক। রসিদ টসিদ নীচেই আছে।

নীচে এসে কিন্তু সকলে হতভম্ব হয়ে যায় রাস্তার ওপর একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে মালপত্র নামাচ্ছে একজন। সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে। ব্যাপার কি? এ বাড়িতে কে এল? বাড়ি ভুল করে নি ত? অনেকরকম প্রশ্ন জমা হয়ে ওঠে।

এগিয়ে আসে সরকার। আরে এ যে জয়ন্ত আর খুশি এসে হাজির হয়েছে। ওদের চিনতে পেরে আরও বেশী অবাক হয়ে যায়

সরকার। কথা নেই, বার্তা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই, এমনি চলে আসার মানে?....তাছাড়া রায়বাহাদুর এই সেদিন মাত্র নিজ হাতে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন বাড়ির একটা ভাড়ার বন্দোবস্ত করতে।.... সরকারের বিস্ময় যেন ফুরাতে চায় না।

জয়ন্ত একটুখানি হাসে। বলে, কি সরকার মশাই, বড় যেন অবাক হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে?

—আজ্ঞে তা একটু হয়েছি বই কি! হঠাৎ মোটঘাট নিয়ে—

—এখানে থাকতে এলাম, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছেন না?

কথাটা যেন অতিরিক্ত সোজা বলে বোধ হয় সরকারের। হা-না বলে উঠতে পারে না। হা করে দেখে শুধু

নটবর পাল পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সবই। যে বাড়ি নগদ চারশো টাকায় ভাড়া করছেন তিনি, সে বাড়িতে বাস করবে মানে? আড়াল থেকে নিজেকে প্রকাশ করে বলে ওঠেন তিনি—এখানে বাস করবেন মানে? জানেন, এ বাড়ি আমি ভাড়া নিচ্ছি? নগদ চারশো টাকা ভাড়া।

—এঁরা কে সরকার মশাই? জয়ন্ত নটবর পাল আর দুলালকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে। নটবরের কথার কোন জবাব দেয় না।

সরকার জানায়—এঁরা বাড়ি দেখতে এসেছেন—

—বাড়ি দেখতে এসেছেন! বেশ, বাড়ি তাহলে এদের দেখান—তবে বাইরের ঐ রাস্তা থেকে। গোটা বাড়িটা খুব ভাল করে ওখান থেকে দেখতে পাবেন, যতক্ষণ খুশি!

নটবর পাল পাকা লোক। ইঙ্গিতটা তাই বুঝতে তাঁর বিশেষ দেরি হয় না। প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন তিনি, কী আমায় বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া! জানো আমি কে বটে! আমার নাম নটবর পাল! পাঁচটি বছর মিলিটারির সাথে কাজ করেছি, হুঁ! মিলিটারি কথাটা খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন নটবর পাল। সেটা জয়ন্তকে

ভাল করে শোনাবার জন্যে, কি নিজের কানে ভাল লাগে সেই জন্যে, তা বোঝা শক্ত।

দুলালও ওপাশ থেকে ফোঁস করে ওঠে। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু বুঝে সুঝে ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন। নেহাৎ কংগ্রেস সরকার দুষমনি করে খেতাব তুলে নিলে, তাই · নইলে উনি রায়সাহেব হতেন তা জানেন ?

নটবর পালও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—হুঁঃ।

জয়ন্ত কিন্তু চটে না। বরং হাসি মিশিয়েই বলে, সেলাম তাহলে বাতিল রায়সাহেব খেতাবের মত আপনার বাড়ি ভাড়া করাটাও এবার বাতিল হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত

নটবর পাল নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকেন। নেহাৎ কলকাতা শহর ; তাই আর কিছু করে উঠতে পারলেন না তিনি বলেন, আচ্ছা, যুদ্ধ থেমে গেছে তাই। তবু আমি দেখে লিব একবার এস হে দুলাল

রাগ দেখিয়ে দুম দুম্ করে চলে যান নটবর যেতে যেতে খুশি না হয়ে উঠেও পারেন না। মাস মাস চারশো টাকা। তাও নয় যুদ্ধ তো থেমে গেছে বলে। তার ওপর আবার এই কংগ্রেসী সরকার।

জয়ন্ত বেরিয়েছিল কয়েকটা কাজে। একা এসেছে কলকাতায়। ঝি চাকর থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই খুঁজে পেতে জোগাড় করে নিতে হবে নিজেকে। সাহায্যের মধ্যে আছে সরকার মশাই তবে, আজকালকার যে রকম এটা নেই—ওটা নেই যুগ চলেছে তাতে ভরসা নেই কারও ওপর !

খুশি একাই ছিল অতবড় বাড়িতে। সেটা খুশি হবার ব্যাপার নয়। একে এই নতুন শহর, তার ওপর এই আধা-পুরনো দৈত্যের মত বাড়ি কানাগলির মুখে নির্জন বাড়িটার চেয়েও নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে খুশির।....সামনে একটা খোলা জানলা। বাইরের

পৃথিবীর সামান্যতম যোগসূত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকে খুশি। কে যেন উঁকি মারছে না জানলা দিয়ে? রোগা মুখ বড় বড় চোখ!

বলি অ খুকি, অ খুকি! আর লোকটা যে ওকেই ডাকছে! খুশি চমকে যায় মনে মনে। ভয়ও পায় না যে, এমন নয়। জানলার ধারে লোকটা সম্পূর্ণ উদয় হয়েছে ততক্ষণ। বলে, একটু শোন ত খুকি।

—কাকে খুকি বলছো তুমি? খুশি বেশ কড়া হতে চেষ্টা করে মুখের ভাবে ও গলার স্বরে।

—এই তোমাকে গো দিদিমণি! এইখান দিয়ে যাচ্ছিনু, তোমাকে দেখে একটু দাঁড়ালুম। অম্লানবদনে বলে চলে লোকটা।

—আমাকে দেখে দাঁড়ালে কেন?

—তা দাঁড়াব না দিদিমণি? কার মুখ দেখে আজ উঠেছিনু, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—না না তুমি যাও! তোমায় আমি চিনি না! রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে খুশি।

—তা আর চিনবে কি করে দিদিমণি! খেতে না পেয়ে পেয়ে উপোসে উপোসে সে চেহারা কি আর আছে। তা দাও না দিদিমণি কিছু পয়সা, পেটভরে একবার খেয়ে আসি!

—না না পয়সা টয়সা হবে না। বাড়িতে কেউ নেই। তুমি যাও!

উঃ! কলকাতা শহরটা কি অদ্ভুত। মনে মনে ভাবে খুশি।

—অ, বাড়িতে কেউ নেই বুঝি। লোকটা যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।—তাতে কি হয়েছে। তা বেশ ত....যাও না তোমার মার বাক্স থেকে গোটা দুই টাকা নিয়ে এস দেখি চট্ করে। কেউ জানতে পারবে না।

লোকটা বলে কি। খুশি এবার সত্যি সত্যি রাগে, ভয়ে ও বিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠে—কি যা তা বকবক করছ। আমার মা-টা কেউ নেই। বাড়িতে এখন আমি একা।

—অ! একা বলে বুঝি তোমার ভয় করছে? তা ভয় কি? এই ত আমি আছি। আমি বরং ভেতরে গিয়ে বসছি ততক্ষণ।

—না না, তোমায় ভেতরে আসতে হবে না। খবরদার বলছি ভেতরে এস না···এস না বলছি—খুশি যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

—তা কি হয় দিদিমণি। ভালমানুষের মত চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলতে থাকে লোকটা—তুমি একা আছ আর আমি না এসে পারি? আমি থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই, দিদিমণি! চেহারা এমন হলে কি হয়, এই রোগা হাড়ে ভেলকি খেলে····একেবারে ভানুমতির ভেলকি। গুণ্ডা বদমাস কাছে এসেছে কি অমনি কুপোকাত···এই দেখো না হাতের গুল্—লোকটা লিকলিকে শিরওঠা হাত পাকাতে থাকে —ও-মাগো। ছুটে পালিয়ে যায় খুশি। লোকটা নির্ঘাৎ চোর না হয়ে যায় না। —'ওমা, দিদিমণি সত্যি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল যে!' লোকটা যেন হতভম্ব হয়ে যায়। লোকটার কাছ থেকে সরে এসেও ভয় কাটে না খুশির। বলা যায় না লোকটা আবার কি করে বসে। ওর পেছনে যে দলবল নেই তাও ঠিক করে বলা চলে না। ভয়ে কাঁপতে থাকে খুশি। এতটুকু মেয়ে হয়ে ডাকাতের সঙ্গে লড়বে কি করে সে?

হঠাৎ কানাগলিতে কার পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়। মেয়েলী জুতোর শব্দ। উৎসাহে উঁকি মেরে দেখে খুশি, যদি কাউকে পাওয়া যায়। একটি মেয়ে, বয়সে ওর দাদার চেয়ে কিছু কম হবে, পরণে সাদাসিদে শাড়ি, খুট খুট করে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। গলির শেষে একটা বাড়ি। দরজার মাথায় একটা সাইনবোর্ড লাগানো! তাড়াতাড়িতে পড়া হয় না খুশির। পড়বার মত মনের অবস্থা তার নয় তখন। তবে বাড়ির ভেতর থেকে কেমন একটা খটাখট্ আওয়াজ আসছে কারখানার মত।

মেয়েটিকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে খুশি। বুকের ভেতরটা

ডবল করে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। কাঁপা গলায় হাঁক দেয়—শুনছেন, শুনছেন।

মেয়েটি এগিয়ে আসে,—কি হয়েছে কি ?

—আমাদের বাড়িতে একটা ডাকাত এসেছে। ফস্ করে বলে ফেলে খুশি !

—ডাকাত !—বিস্মিত হলেও হাসি পায় যেন মেয়েটির।

—হ্যাঁ, খুনে, বদমায়েস, ডাকাত !—যতরকম ভয় পাবার মত কথা জানা আছে, খুশি বলতে থাকে।—দেখুন না, এত করে বলছি কিছুতেই যাচ্ছে না !

—ও, তাহলে খুব অবাধ্য, অসভ্য ডাকাত বলতে হবে ত ! কিন্তু এমন দিন দুপুরে ডাকাত এল কি করে ?

—আমি একলা আছি কিনা তাই।

—এই এত বড় বাড়িতে তুমি একলা আছ ! আর কেউ নেই ? মেয়েটি এবার সত্যি সত্যি অবাক হয়। এতদিন ধরে বাড়িটা দেখছে খালি পড়ে আছে। এতদিন ভাঙা ঝরঝরে ছিল, ইদানীং চূন-বালির ছোঁয়াচ লেগেছে। কিন্তু এই একলা মেয়ে এখানে এল কি করে ?

খুশি বলে, না, দাদা আমায় রেখে চাকরের খোঁজ করতে বেরিয়ে গেছে। আমরা আজ সবে এসেছি কি না !

—ওঃ তোমরা আজ সবে এসেছ।—এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় ওর কাছে।—আচ্ছা চল দেখি কি রকম তোমার ডাকাত।

ব্যাপারটা আর বেশী ঘোরালো হয়ে ওঠে না। খুশির খুনে ডাকাতকে দেখে খুব খানিকটা হেসে নেয় ওই মেয়েটি। তারপর বলে, এই তুমি কি করছ এখানে ? কি মতলব তোমার ?

—এজ্ঞে কিছু না দিদিমণি। গরীব মানুষ ভিক্ষে করে খাই—দাও না কিছু ভিক্ষে—

—ভিক্ষে করতে তোমার লজ্জা করে না···জোয়ান মদ্দ কাজ করে খেতে পার না ?

—তা আর পারি না।—লোকটা যেন কৃতার্থ হয়ে ওঠে।—মনের মত কাজ পাই কোথায় ?

—কি কাজ পারো তুমি ?

—কেন, হাট বাজার রান্নাবান্না !

—তাই নাকি ? এঁদের ত শুনছি লোক দরকার ! কাজ করবে তুমি ?

ওর জবাব দেবার আগেই খুশি বলে ওঠে—না, না, ওকে দরকার নেই আমাদেব। ওর রকমসকম যে বকম।

—বেশ ত ও একটু বসুক না, তোমার দাদা এসেই না হয় যা করবাব করবে। আমি এখন আসি, কেমন ? পাশেই আমি আছি। ভয় নেই তোমার কিছু ! মেয়েটি চলে যেতে চায় এবাব। যাবার আগে লোকটাকে প্রশ্ন করে, তোমাব নাম কি ?

—নাম ? নাম দুর্লভ ঠাকুর গো—দুর্লভ ঠাকুর !

—দুর্লভই বটে। পাতলা হাসিতে ঠোঁট রাঙিয়ে মেয়েটি চলে যায় !

খুশি বলে. আপনার নাম ত বলে গেলেন না ? আমার ভয় করলে আপনাকে কি বলে ডাকবো ?

—আমার নাম প্রণতি !

কানাগলিতে অদৃশ্য হয়ে যায় মেয়েটি। মুহূর্তের নিস্তব্ধতায় কানাগলির সেই সাইনবোর্ড লাগানো ঘরটা থেকে আওয়াজ ভেসে আসে খটাখট্ খটাখট্

॥ তিন ॥

কানাগলির সেই সাইনবোর্ড লাগানো বাড়ি, যেখান থেকে শব্দ হচ্ছে খটাখট্, খটাখট্ সেই বাড়ির সাইনবোর্ডের লেখা স্পষ্ট হয়ে আসছে এবার। সেখানে বড় বড় করে লেখা 'নবজীবন প্রেস'। তারও

নীচে ছোট করে লেখা 'নতুন খবর কার্যালয়'। প্রথমটা দেখলে হেসে ওঠে লোকে। এই স্যাঁৎসেঁতে কানাগলির মধ্যে আবার নব জীবন? বলে নতুন খবর? সোনার পাথর বাটি? কেউ অজ্ঞাত প্রেস মালিকের রসজ্ঞানের তারিফ করে, কেউ বলে চোবের আড্ডা। কেউ বলে খবর ত সেই একটাই—আদি ও অকৃত্রিম—এই কানা-গলিতে লোকের চোখে ধূলো দেবার একটা কল মাত্র, এর আব নতুন পুরনো কি? কিন্তু যারা জানে, তারা বোঝে 'নতুন খবর' কি ও কেন? এই কানাগলির এক প্রান্তে এই ভাঙা নড়বড়ে বাড়ির মধ্য থেকে যে আওযাজ নির্গত হয় প্রতিনিয়ত, সে আওয়াজ কি খবর, কি আহ্বান বহন কবে আনে! যাদেব মনে সে সংবেদন আছে তারা উপলব্ধি করতে পারে একপাশে পড়ে থাকা জীবন থেকে কি করে বেঁচে থাকাব দাবির উদ্বোধন ঘটে! উত্তাল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে কাগজের নৌকার মতই যে অতলগামী জাহাজখানা, তার আর্তনাদ যতই ক্ষীণ হোক, কত সুদূরস্পর্শী, কত প্রাণময়!—একথা বোঝে যে থাকে সেই নিমজ্জমান জাহাজের একজন হয়ে।

কথাটা সত্যিই, মিথ্যে নয়। খবর আসলে একটাই। বিত্তশালী প্রতিপত্তিশালীদের মনোহর চক্রান্তের চাপে পড়ে যেখানে গণমত পদ-দলিত, পিষ্ট, কণ্ঠরুদ্ধ, সেখানে সেই মুখোশধারী দেশসেবক জননায়কদের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষীণ অথচ দৃপ্ত আওয়াজ ধ্বনিত করে তোলা। জনগণকে সচেতন করে তোলার নিত্য নতুন প্রচেষ্টা মাত্র। একই খবর শুধু নতুন করে বলা, নতুন জোর দিয়ে বলা।

এই প্রেসের যিনি কর্মাধ্যক্ষ, যিনি পরিচালক, তাঁর জীবনের একটা ইতিহাস আছে, অনেকটা এই কানাগলির স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকারের মতই আশাহীন সে কাহিনী। অল্প বয়সে অভাবে পড়ে নিবারণবাবুকে কাজ নিতে হয়েছিল এক পত্রিকা কার্যালয়ে। কমপোজিটার ছিলেন। অন্ধকার আর ভাঙা একখানা ঘরে টুলের ওপর বসে একইভাবে প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্ষরের পর অক্ষর

সাজিয়ে যেতেন তিনি কপি ধরে। তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন লোক যারা অক্ষর সাজিয়ে চলত একটির পর একটি।....সেই সাজানো অক্ষর ছাপাখানার যন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তিতে ছাপা হয়ে চলত। তারপর যখন বার হত পত্রিকা-আকারে তখন পাঠক মহলে সেই অক্ষরগুলো যে কি চাঞ্চল্য আনত তা এখনও মনে পড়ে নিবারণবাবুর। সম্পাদকের নামটা থাকতো কাগজের নামের ঠিক নীচে জ্বলজ্বল করতো নিবারণবাবুর নিজে হাতে সাজানো বাছা বাছা ভাল আর বেশী পয়েন্টের অক্ষরগুলো দিয়ে লেখা সম্পাদকের নাম। জ্বলজ্বল করতো একইভাবে, পরিচালকের নাম, প্রকাশকের নাম।...নিবারণবাবু পড়ে দেখেছেন কতবার....আগুনের মত মনে হত লেখাগুলো। যে লেখাগুলো অক্ষর সাজানোর সময় সেই অন্ধকার ঘরে শুধু কতকগুলো পোকার মত কিলবিল করত, সেগুলোই ছাপার পর জ্বলন্ত আগুন হয়ে উঠত। ইলেকট্রিক আলো একটা ছিল। কিন্তু তার আলো এসে পৌঁছত না নিবারণবাবুর টেবিলে। অনেকবার বলেছিলেন কর্তৃপক্ষকে একটা আলোর জন্যে। ফল হয় নি বিশেষ। জবাব এসেছিল—চোখে না দেখলে কমপোজিটার হওয়া সাজে না! এটা প্রেস, কাজের জায়গা এ জবাব শুধু মুখ বুজে শুনে যেতে হয়, প্রত্যুত্তর দেওয়া চলে না—চলে না বিশেষ করে তিরিশ টাকা মাইনের কমপোজিটারের পক্ষে। তাছাড়া জবাব দেবার সময় কোথায়? অন্যদিকে মন থাকলে ফর্মা বাকী পড়ে যাবে! কাজেই কেস থেকে হরফ হাতড়াতে হত নিবারণবাবুকে—তাড়াতাড়ি কাগজ ছাপা হলে মানুষের মনে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলবে। যে কাগজ দেশের ও দশের—বিশেষ করে চাষী মজুরদের সেবা ও দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবার ভার নিয়েছে, সেখানে সময়ের অপব্যবহার করলে চলে না।

কাগজের মালিক লোক ভাল। প্রত্যেক দেশনেতা, শিল্পপতি আসা যাওয়া করেন কাগজের অফিসে। দেখা হলে টুল ছেড়ে উঠে

দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে হয় নিবারণবাবুকে। একটু মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যান তিনি। কত লোকের যাতায়াত। বলতে গেলে দেশের জনমতের একমাত্র প্রতিনিধি তিনি। জনমতের কর্ণধারও বটে। লোকে শ্রদ্ধা করে তাঁকে জনহিতৈষী হিসাবে।...কাগজের বিক্রী বেড়েছে অনেক। নতুন মেশিন এসেছে। বাড়িটা কাগজের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেছে। মালিক গাড়ি কিনেছেন দু'খানা। শীঘ্রই একটা বড় ভ্যান কেনা হবে। ম্যানেজারের মাইনে বেড়েছে। মালিকের নিজের ছেলেকেই অবশ্য ম্যানেজার করে রেখেছেন। তাতে কাজের সুবিধা হয়। মালিকের অনুপস্থিতিতে কোন বিঘ্ন ঘটে না। কাগজের পলিসি বজায় থাকে।....সবই বেড়েছে কাগজের বিক্রী বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে অনেক। কেবল দূর হয় নি নিবারণবাবুর সেই ঘরের অন্ধকার। মাইনেটা বেড়ে হয়েছে ত্রিশ থেকে বত্রিশ এই একাদিক্রমে ত্রিশ বছরের চাকরির পর। বিশ বছর পরে মনের মধ্যে একটা মস্ত বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন সাপের মত ফোঁস করে উঠেছে! প্রশ্ন উঠেছে—কেন? কেন এই অসাম্য? কেন এই অসাধুতা, চালাকি? কেন তবে এই দেশের সর্বহারাদের উদ্দেশ্যে এই ফাঁকা আওয়াজ!

খুশিদের বাড়ির পাশে এই অন্ধকার কানাগলির মধ্যে এই নবজীবন প্রেসের খটাখট্ শব্দের মত নিবারণবাবুর স্যাঁতসেঁতে জীবনে একদিন আওয়াজ উঠল। এতদিন শুধু অক্ষর দিয়ে খবর সাজিয়ে এসেছেন আজকে তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার ব্রত নিলেন। একটা দল গড়লেন এই বঞ্চিত প্রেস-কর্মচারীদের নিয়ে। যাদের সাহস আছে মনে, বিশ্বাস আছে, বিদ্রোহে তারা যোগ দিল তাঁর সঙ্গে। কাজ ছেড়ে দিলেন তাঁরা একজোটে। কিছুটা প্রলোভন এলো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, কিছুটা আবার চোখ-রাঙানী ভয়-দেখানো—তাতে কারও কারও বিশ্বাস হারাল, সাহস টলল, কিন্তু টললেন না নিবারণবাবু নিজে আর তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন সঙ্গী।

তাঁরাই এসে জড় হলেন এই কানাগলির ভাঙা বাড়িতে। যার যা ছিল সঞ্চয়. জড় করলেন ভাঙা ঘরের ভাঙা টেবিলের ওপর। তারপর শুরু হল নবজীবন প্রেস। নতুন খবর বেরুল। সত্যিই নতুন একটা খবর। যারা মুখোশ পরে হিতৈষী সেজে আছে জনগণের শ্রদ্ধার সিংহাসনে, তাদের মুখোশ খোলার দুরন্ত খবর নিয়ে আগুনের মত জ্বলে উঠল নতুন খবরের পাতার পর পাতা।

সেই থেকে আজও নতুন খবর বেরিয়ে চলেছে মাসের পর মাস, কলেবর তার বেড়েছে, বেড়েছে গ্রাহক। তবে কানাগলির ভাঙা বাড়ি তার বদলায় নি। যে বাড়ি একদিন আশ্রয় দিয়েছিল তাঁকে সে বাড়ি নিবারণবাবু ছাড়েন নি। যারা নতুন খবরকে ভালবাসে তারা এই ভাঙা বাড়িকেও ভালবাসে। তাই আজও হঠাৎ শোনা কানে কানাগলির মধ্যে খটাখট্ মেশিন চলার শব্দ চমক লাগায়, হঠাৎ দেখা চোখে বিদ্রূপ জাগায় নবজীবন প্রেসের সাইনবোর্ডখানা। কিন্তু যারা জানে তারা জানে নতুন খবর কি ও কেন?

প্রণতি খুশির ডাকাতকে শায়েস্তা করে প্রেসে এসে ঢুকল। প্রেসের পিছনে খান কয়েক ঘর নিয়ে বিপত্নীক নিবারণবাবু তাঁর একমাত্র মেয়ে প্রণতিকে নিয়ে থাকেন। কি একটা কাজে প্রণতি বেরিয়েছিল সকালে, মনে ছিল তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কারণ নতুন খবরের সম্পাদক কুঞ্জ মজুমদারকে আজ খেতে বলা হয়েছিল ওদের বাড়িতে। তাড়াতাড়ি ফিরছিল প্রণতি কিন্তু পথে খুশির ডাকে দেরী হয়ে গেল। নিবারণবাবু যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কুঞ্জ এসে বসে আছে অনেকক্ষণ। প্রণতিকে আসতে দেখে কুঞ্জই মন্তব্য করলে, আমাকে যে আজ নেমন্তন্ন করা হয়েছে সেটা বোধ হয় ভুলেই গেছ প্রণতি—না?

—না ভুলবো কেন? বাড়ি ঢোকবার পথে হঠাৎ পাশের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল যে!

—ধরে নিয়ে গেল!

—হ্যাঁ। সে বেশ মজার ব্যাপার, পরে বলবো'খন।

কুঞ্জর সঙ্গে প্রণতির ব্যবহার বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ। কুঞ্জর বয়স ত্রিশের কোঠা পার হয়েছে। তবে খবরের কাগজে কাজ করছে অনেক দিন। লেখার জোর আছে যতটা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ততটা নয়। একটু অহমিকাও আছে। তবে নিবারণবাবু ওকে নিজে থেকেই কাগজের সম্পাদক করে নিয়েছেন। ওর প্রতি তাঁর বিশ্বাস এখনও অটুট।

কুঞ্জর সহায়ক হয়ে আছে প্রণতি। অনেকদিন একই সঙ্গে কাজ করে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই ছুটির দিনেও মাঝে মাঝে কুঞ্জ আসে। খাবার নেমন্তন্ন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আজ প্রেস বন্ধ তাই কুঞ্জকে খেতে বলা হয়েছে দুপুরে। অবশ্য একটা জরুরী কাজের কিছু বাকি ছিল, সেটুকু সকালে সমাপ্ত করতে হয়েছে। তার আওয়াজই কানে গেছে খুশির।

একেই ত দেরী হয়ে গিয়েছিল প্রণতির বাড়ি আসতে। তাই আর অপেক্ষা না করেই সে সবাইকে ভেতরে যেতে ডাকলে। কিন্তু ভেতরে যাবার পথে বাধা পড়ল তিনজন অচেনা লোক অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন বেশ সুসজ্জিত। বড় চোখ, মোটা ভুরু, উঁচু নাক, মেজাজী নেতার মত চোখের দৃষ্টি, শেরওয়ানীর ওপর ঝোলান চাদর। দেখলেই চেনা যায় কোন্ জাতের লোক ইনি।—যে জাতের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে চলেছে নতুন খবরের স্ফুলিঙ্গ। একটু নজর করতেই ভদ্রলোকের আসল পরিচিতি স্পষ্ট হয়ে আসে মেঘমুক্ত আকাশের মত প্রণতির মনে। আর কেউ নয়—ইনি যোগজীবন সমাদ্দার। গায়ের মোটা খদ্দর তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাকে মোটা করতে পারে নি আজও। রাজনীতিকে ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত নীতির অভিযান চালিয়ে চলেছেন তিনি এখনও। আগামী নির্বাচনে তিনি তাই একজন বড় প্রার্থী। খুঁটির জোর আছে পিছনে, তাই এ

পথে নেমেছেন তিনি। নতুবা অনর্থক এই সব দলাদলির মধ্যে তিনি মাথা দিতেন কিনা সন্দেহ।

সকলের মাঝামাঝি চোখ রেখে এবং সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যোগজীবন প্রশ্ন করেন, এইটেই ত নবজীবন প্রেসের অফিস?

নিবারণবাবু বিনীত হয়ে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু সে প্রেস আজ বন্ধ।

একটু ইতস্ততঃ করেন যোগজীবন সমাদ্দার। তারপর বলেন, তা হোক, সম্পাদক বা প্রেসের মালিকের সঙ্গে শুধু একটু আলাপ করতে চাই। আপনি—

—হ্যাঁ আমিই ম্যানেজার, আর ইনিই নতুন খবরের সম্পাদক কুঞ্জবাবু!

—ও, নমস্কার নমস্কার।—এতক্ষণে মৌখিক ভদ্রতাটুকু করেন যোগজীবন।—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত খুশি হলাম। আমায় বোধ হয় চিনতে পারছেন না?

কুঞ্জ কথা বলে এইবার। বলে, তা আর পারছি না। আপনি স্বনামধন্য যোগজীবন সমাদ্দার। এই ওয়ার্ড থেকেই ত এবার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন।

এই সুযোগে যোগজীবনও যেন বিগলিত হয়ে ওঠেন—আপনাদের পাঁচজনের অনুগ্রহ আর আশীর্বাদই আমার ভরসা।

অনুগ্রহ আর আশীর্বাদের দরকার কি মশাই! ভোট ত ভোট ইচ্ছে করলে এ গোটা পাড়াটাই কিনে নিতে পারেন, তা-কি আর জানি না?

প্রণতি চেয়ে ছিল কুঞ্জর মুখের দিকে। কুঞ্জর গলার স্বরে এই উচ্ছ্বাসের আতিশয্যটা তার ঠিক ভালো লাগে না। একটু যেন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

যোগজীবন এক মুহূর্ত কি যেন দেখেন ওদের দিকে, তারপর

কুঞ্জর কথা টেনে জবাব দেন, ছি, ছি, ও কি কথা বলছেন ? ভোট কি কেনবার জিনিস ! আপনারা স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে যদি আপনাদের সেবা করবার সুযোগ আমায় দেন তাহলেই আমি ধন্য মনে করবো।

জবাবটা দিলেন নিবারণবাবু। কুঞ্জর মত তাঁর মুখে কোন প্রতিফলন নেই তাঁর মনের। শুধু বললেন, আমাদের সেবার সুযোগ ত আপনি আগেও পেয়েছেন যোগজীবনবাবু ! গরীবদের টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন, তাতে এখন লালবাতি জ্বলছে। হা-ঘরেদেব জমি আর বাড়ি তৈরী করে দেবার আশা দিয়ে বিরাট বিল্ডিং-ট্রাস্ট গড়েছিলেন সে বিল্ডিং-ট্রাস্টের জমি এখনও শূন্যে মিলিয়ে আছে....এখন আবার ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আমাদের—

শেষ করতে দেবাব আগেই ধৈর্যচ্যুতি হল যোগজীবনের। বলে উঠলেন গলার স্বর আগেব মত ঠাণ্ডা রেখে—আমার ওপর অবিচাব করবেন না নিবারণবাবু, সমস্ত প্ল্যান ত এই যুদ্ধেই ভেস্তে গেল। কি দিন সব গেছে বলুন ত !—যোগজীবনের চোখে যুদ্ধের দিনের অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ল চকিতে।

আরও স্থিরভাবে বললেন নিবারণবাবু—হ্যাঁ, যুদ্ধটা খুব একটা অসুবিধার অজুহাত বটে ! ঠাণ্ডা বরফের জ্বালা আগুনের চেয়ে কম নয় বুঝি !

একেবারেই কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন যোগজীবন সমাদ্দার।

—দেখুন, সে যা হবার হয়ে গেছে, এবার কিন্তু আপনাদের সমর্থন পেলে আমি কি যে করতে পারি এই দেখুন এই ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে আমি নিবেদন করেছি—! পকেট থেকে এক গোছা কাগজ বের করে পড়তে লাগলেন যোগজীবন দরদ দিয়ে—আজ ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা বহু দুর্ভোগ, বহু নির্যাতন সহ্য করিয়াছি। বহু প্রাণ উৎসর্গ হইয়াছে ! বহু গৃহ শ্মশান হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই আত্মত্যাগ বিফলে যায় নাই। আজ সত্য সত্যই আমরা এক নূতন

জীবনের সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। তবে, স্বাধীনতা শুধু অর্জন করিলেই হয় না, সেই স্বাধীনতাকে—প্রাণ অপেক্ষা মূল্যবান সম্পদকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা সঞ্চয় করিতে হয়। আমরা যাহাতে আমাদের অগণিত জনগণের অভাব অনটন মোচন করিতে পারি তাহার জন্য আমাদের সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে যাহাতে আমাদের প্রকৃত প্রতিনিধিগণের হস্তে, অকৃত্রিম সেবকদের ও পরীক্ষিত নেতাদের উপর আমাদের শাসনভার অর্পিত হয়।—

যোগজীবন আপনমনেই পড়ে চলেছিলেন। তাঁর বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠছিল। হঠাৎ মাঝপথে নিবারণবাবু বললেন—শুনেছি আপনার বক্তব্য, এখন আমাদের কি করতে হবে?

—অ্যাঁ? স্বপ্নভঙ্গের মত শোনাল যোগজীবনের গলার স্বর। বললেন, এই নিবেদনটি দয়া করে ছেপে দিতে হবে!

একটুও সংকোচ করলেন না নিবারণবাবু। অনায়াসে বললেন, কিছু মনে করবেন না · নিবেদন আমরা ছাপতে পারব না!

—ছাপতে পারবেন না!—একাধারে বিস্ময় ও বিরক্তি ফুটল যোগজীবনের কুঞ্চিত মোটা ভুরুতে।—ওঃ আপনি ভাবছেন বিনামূল্যে ছাপিয়ে নিতে চাই! না না বাজার রেটের অনেক বেশী ...পাঁচগুণ কি দশগুণ এর জন্যে পাবেন!

—কিন্তু এখানে বাজার রেটের কথা হচ্ছে না যোগজীবনবাবু!

—তাহলে, ছাপতে আপত্তি কিসের? অবাক হন যোগজীবন।

—আপত্তিটা সত্যি শুনতে চান? খুব মুখরোচক কিন্তু হবে না!

—তা হোক, আপনি বলুন! যোগজীবন নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন শোনবার জন্যে। নিবারণবাবু যোগজীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে বললেন, আপত্তি এই জন্যে যে এই নিবেদনের একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।

মস্ত একটা বাজ পড়ার মত শোনাল নিবারণবাবুর গলার স্বর। সকলে নিস্তব্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সামনেই দাঁড়িয়ে যোগজীবন

সমাদ্দার—গোটা ওয়ার্ডটা যাঁর মুঠোর মধ্যে। কুঞ্জ যেন মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। নিবেদন বিশ্বাস হোক আর না হোক ছাপতে ক্ষতি কি? বরং ছাপলে দু'পয়সা ঘরে আসবে। একটু বিরক্ত হয়েই বলে কুঞ্জ, আহা বিশ্বাস করুন না করুন তাতে কি আসে যায়? এ ত আপনার নিজের কথা নয়। পরে যা খুশি লিখুক না। ভাল দর পেয়ে আপনি ছাপবেন! এতে আপনাব দায়টা কিসের?

নিবারণবাবু কুঞ্জকেই জবাব দেন।—দায় একটু আছে বই কি কুঞ্জবাবু। এ প্রেসে যোগজীবনবাবু এ নিবেদন ছাপলে ওর সঙ্গে নিজেদেরও খানিকটা জড়িয়ে ফেলতেই হয়!—

যোগজীবন একটু বাঁকা স্বরেই বলেন, জড়ালে আপনার লাভ বই লোকসান নেই নিবারণবাবু! আপনার এই প্রেসের আর সাপ্তাহিক কাগজের চেহারাটাই তাতে ফিরে যেতে পারে—সেটা ভেবে দেখেছেন?

নিবারণবাবু একটু হাসলেন।—ভেবে দেখেছি বলেই ত এত আপত্তি। চেহারা বদলালে চরিত্রটা বাঁচাতে পারবো না তাই এত ভয়!

যোগজীবন গম্ভীর হলেন আর একটু। বললেন, তবু আর একবার ভেবে দেখবেন নিবারণবাবু—অনেক বড় বড় প্রেস শহরে আছে, কাগজও শুধু এই একটি নয়। নেহাৎ আপনি পাড়ার লোক তাই.....

কথাটা শেষ করতে দিলেন না নিবারণবাবু যোগজীবনকে। নিজেই বলে উঠলেন—তাই যত ক্ষীণই হোক নিজের পাড়া থেকে কোন বেসুরো গলা যাতে না শোনা যায় তার ব্যবস্থা করতে চান, কেমন! অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যোগজীবনবাবু যে আপনার সোনার ফাঁসে আমাদের গলাটা বাড়িয়ে দিতে পারলাম না!

কথাটায় একেবারে ছেদ টেনে দিয়েছিলেন নিবারণবাবু চরম বাক্য

দিয়ে। কিন্তু তার ওপর যোগজীবন জোর করেই আরও কতকগুলো কথা যোগ করে দিলেন। বললেন, সোনার ফাঁস যারা হেলায় ঠেলে ফেলে অনেক সময় দড়ির ফাঁসই তাদের কপালে জোটে, সেটা বোধ হয় আপনার জানা নেই!

যোগজীবনের মোটা ভুরু বিদ্যুতের মতই এঁকেবেঁকে উঠল। গলার ধ্বনিতে হল তার শব্দ। সঙ্গীদের নিয়ে প্রস্থান করলেন তিনি। নিবারণবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে ফুটে উঠল অল্প অল্প হাসির রেখা।

কুঞ্জ যেন আর্তনাদ করে উঠল। বললে, বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না নিবারণবাবু। একেবারে ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছেন। একা যোগজীবন সমাদ্দার হলে কথা ছিল, ওর পেছনে কে আছে জানেন? কতবড় ওর খুঁটির জোর? সমস্ত ছাপাখানার চুলের টিকি যার হাতে বাঁধা! কুঞ্জ নিবারণবাবুর চোখে মুখে একটা আশঙ্কার ছায়া দোলাতে চেয়েছিল। কিন্তু শীতের আকাশের মত নিবারণবাবুর মুখে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তবে, মনে মনে একটি নাম তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। সে নাম ধরণীধর চৌধুরী।

॥ চার ॥

মুখে অনুচ্চারিত রাখলেও মনে মনে যোগজীবন এই একই নাম বোধ হয় উচ্চারণ করেছিলেন নিবারণবাবুর সঙ্গে—সে নাম ধরণীধর চৌধুরী। বিদ্যুতের চকিত আলো খবর নিয়ে আসে ঝঞ্ঝার—দুর্যোগের, তাই নবজীবন প্রেস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যোগজীবনের মোটা ভুরু বিদ্যুতের মতই এঁকেবেঁকে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল একটি ইঙ্গিত নিবারণবাবুর মনের আকাশে। একটি নাম মনে মনে আবৃত্তি করেছিলেন নিবারণবাবু! ধ-র-ণী-ধ-র চৌ-ধু-রী।

নবজীবন প্রেস থেকে বেরিয়ে যোগজীবন সমাদ্দার এসে উপস্থিত হলেন ধরণীবাবুর বাড়িতে। স্যাঁৎসেঁতে কানাগলির ভাঙ্গা বাড়ির আবহাওয়া থেকে রাজপথের এই অট্টালিকা! রাজপথের এত আলো—এই আলো দিয়ে ঝলসে দিতে পারা যায় কানাগলির স্ফুলিঙ্গকে! জল দিয়ে জল বাঁধে, আলো দিয়ে আলোকে বাঁধা যায় না? একফালি হাসি ফুটে উঠল যোগজীবনের মুখে! পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। ঠিক এমনি ধরণের ফিকে হাসি হেসেছিল না নিবারণ একটু আগে? আর কি যেন বলেছিল সেই সঙ্গে?—চেহারা বদলালে চরিত্রটা বাঁচাতে পারবে না তাই এত ভয়! আবার হাসলেন যোগজীবন! পিপীলিকার ডানা কেন ওঠে মনে আছে নিবারণের? বত্রিশ টাকা মাইনের সেই ঘুপসি ঘরের কম্পোজিটার নিবারণ মিত্তির।

বারান্দা পেরিয়ে ধরণীধরের বসবার ঘর। অবশ্য এই বসবার ঘরে ধরণীধর ছাড়া আর সকলে বসে। সেটা জানা আছে যোগজীবনের। এই দুপুরে হয়ত দেখা যাবে ধরণীধর বসে আছেন ঠিক বারান্দাটার ওপর। আশে পাশে বসে আছে সেক্রেটারী আর স্টেনোর দল....হাতের কাছে একটা টেলিফোন রিসিভার। রিসিভারটা মুঠোর মধ্যে নাড়াচাড়া করার মতই হাজারটা কারবার মুঠোর মধ্যে নাড়াচাড়া করছেন ধরণীধর অবলীলাক্রমে!

আন্দাজটা মিথ্যে হল না যোগজীবনের। বারান্দার একপাশে একটা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন ধরণীধর। আদুড় গা, হাটু অবধি কাপড়! একজন চাকর এক বাটি তেল নিয়ে গা ডলছে! পাশে একজন স্টেনো—চেহারাতে ফিরিঙ্গি বলে মনে হয়। ফিট্‌ফাট কেতাদুরস্ত চেহারা। এই পরিবেশে কেমন যেন বেমানান। আরও কয়েকজন যুবককে দেখা যাচ্ছে—ধরণীধরের একজিকিউটিভ!

ধরণীধরের বয়স হয়েছে বেশ কিন্তু এখনও শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের চামড়া তেলের পিচ্ছিলতায় আলো-ঠিকরানো। এক ঝলকের

দৃষ্টিতে দেখে নিলেন যোগজীবন ধরণীধরকে। শহরের সেরা সেরা কাগজের একমাত্র কর্ণধার—জনমতের প্রতীক এই ধরণীধর চৌধুরী। তার ওপর এই কাগজ অনটনের দিনে, ফটকে বিভিন্ন জাতের কুকুর বাঁধার মত আর সাতটা প্রেসের টিকি বাঁধা ঐ হাতের মুঠোর কাছে রাখা টেলিফোন রিসিভারটার সঙ্গে! ধরণীধর একটি ডিকটেশন দিচ্ছিলেন স্টেনোকে যোগজীবন দূর থেকেই জোর গলায় হেঁকে উঠলেন, আচ্ছা ধরণী, তুমি কি কোন কালে শোধরাবে না?

—অ্যাঁ! ধরণীধর চেয়ে দেখেন গলার স্বর শুনে। বলেন, আরে যোগজীবন যে! ব্যাপার কী হে!

—বলছি কোন কালে কি আদব-কায়দাগুলো শিখবে না? এটা কি রকম অসভ্যতা বলত!

—কোন্‌টা? চোখটা আধবোজা রেখে তেল-ডলা উপভোগ করতে করতে বলেন ধরণীধর।

—কোনটা আবার,—এই অসভ্যের মত এলো গায়ে বসে তেল-মাখা! কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন যোগজীবন!

—তেল ত এলো গায়েই মাখতে হয়! তুমি কি জামা জুতা পরে শাল দোশালা গায়ে দিয়ে তেল মাখো নাকি? নিজের কথায় নিজেই হাসতে থাকেন ধরণীধর!

—আহা তা মাখবো কেন! কিন্তু এমন সকলের সামনে বসে মাখাটা অভদ্রতা নয়?

—হতে পারে! কিন্তু ভদ্রতার কড়ার তো কারুর কাছে করি নি!

একটু যেন বিচলিত হন যোগজীবন! সেই সুযোগে ধরণীধর তাকান তাঁর দিকে। যোগজীবন বলেন, তোমার মত লোকের এটা মানায় না!

—ও, মানায় না!—আবার একটা তেলের থাবড়া পড়ে পিঠের ওপর! ধরণীধর একটু থামেন চোখ বুজিয়ে। তারপর বলেন—

কেন, আমি ধরণীধর চৌধুরী কুলির ঠিকাদার থেকে আজ মস্ত বড়লোক হয়েছি বলে? দেখো যোগজীবন! বড় মানুষ হয়ে তুমি যেন চোরদায়ে ধরা পড়ছে! তোমায় সাজতে হয়, গুজতে হয়, ওই ভেড়ার পালের ফ্যাশান মাফিক চলতে হয়। তোমার মত আহাম্মুখ ত আমি নই। বড় যদি হয়ে থাকি সে কি ওদের আদব কায়দার কাছে দাসখৎ লিখে দেবার জন্যে। কথার শেষে অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠেন ধরণীধর। যোগজীবনের মনে পড়ে যায় ধরণীধরের পূর্ব ইতিহাস। বিহারের কয়লাখনির কুলি-সাপ্লাইয়ের এজেন্ট ধরণীধর চৌধুরীর বিচিত্র জীবন-কাহিনী! প্রথম যৌবন তখন তাঁর! গায়ে তখন চর্বির বাহুল্য নেই, আছে প্রতিটি পেশির সুদৃঢ় কুঞ্চন। হাতের মুঠোয় একটি বেটন। পায়ে মিলিটারি বুটের মত জুতো। · একটি অঙ্গুলি হেলনে দলে দলে যোয়ান মদ্দ এগিয়ে চলেছে খাদের দিকে··· চলেছে কালো কালো পাথরের মত মানুষের সারি, সাপুড়ের বাঁশি-শোনা বিষদাঁত ভাঙা সাপের মত তাদের গতি।···কোন প্রতিবাদ নেই·· তবে হ্যা, যাদের ঘরে আছে যোয়ান বউ যোগজীবনের চিন্তায় ছেদ পড়ল। ধরণীধর বলে উঠলেন, বস হে যোগজীবন, আমি এই চিঠিটা শেষ করে দিই। তারপর স্টেনোর দিকে ফিরে বলেন,—হ্যাঁ, লেখো, শালা বদমাস্, তোমার মত ছুঁচোকে কি করে সিধে করতে হয় ভালো করেই আমি জানি তিনদিনের ভেতর আমার মাল যদি পৌঁছে না দাও ত টুঁটি চেপে ধরে চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব!

যোগজীবন চমকে উঠে বল্লেন—এটা কি হচ্ছে! চিঠির ডিকটেশন?

—তাছাড়া কি! একটুও বিচলিত না হয়ে বলেন ধরণীধর।

—কিন্তু এটা কি রকম ভাষা!

—ওটা আমার ভাষা!—আবার এক থাবড়া পড়ে তেলের!—তোমাদের মত স্কুল-কলেজকে ঘুষ দেবার পয়সা ত ছিল না যে লেখাপড়া শিখব!

—উনি ঐ ভাষাতেই লিখবেন নাকি? দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন যোগজীবন মনে মনে। নাঃ ধরণীধরের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা!

—পড়ুন ত কি লিখেছেন? যোগজীবনকে শোনাবার জন্যেই বলেন ধরণীধর স্টেনোকে। স্টেনো পড়ে—টু দি ম্যানেজার—ওরিয়েণ্টাল ট্রেডিং কোম্পানি। ডিয়ার সার, আই বেগ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট, ইনস্পাইট অব বিপীটেড রিমাইণ্ডারস্, দি মেশিন প্রমিজ্‌ড্ আস এ মান্থ এগো হ্যাজ নট ইয়েট বিন ডেলিভার্‌ড টু আস। আনলেস দি টার্মস অব আওয়ার কনট্রাক্ট আর ফুলফীল্‌ড্ উইদিন থ্রি ডেজ ফ্রম দি ডেট উই উইল হ্যাভ নো-আদার অলটারনেটিভ বাট টু টেক লিগ্যাল স্টেপ্‌স টু রিয়েলাইজ ··শেষ হবার আগে হো-হো করে হেসে উঠে যোগজীবন বলেন, ওঃ তাই বল। এটা হল অনুবাদ! কিন্তু এতগুলো প্রেসের কারবার তুমি চালাও কি করে তাই ভাবি!-

এই কথার উত্তরে ধরণীধর যে কি বলবেন তা জানা আছে যোগজীবনের। যখনই যোগজীবন বিস্ময় প্রকাশ করেন ধরণীধরের অমার্জিত ব্যবহারের এবং অল্প শিক্ষার তখনই যেন ভীষণ হয়ে ওঠেন ধরণীধর। সে ভীষণতা ভয়াবহ নয়, সে ভীষণতা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর উপহাসে দুর্বার।

ধরণীধর প্রত্যাশিত ঢঙেই বলেন, কেন তোমাদের ওই কেতাবী বিদ্যে না থাকলে বুঝি আর কাগজ চালান যায় না! কাপড় পরতে নিজেকেই তাঁতি হতে হয় বুঝি!—এই মুখরোচক উদাহরণটির উল্লেখ করতে একবারও ভুল হয় না ওঁর—এঁরা তাহলে আছেন কি করতে? বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব অমূল্য রত্ন—এই আমাদের অবনীবাবু, শশধরবাবু—

যোগজীবন এবার অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। আর যাই হোক তিনি নিজে একদিন ছাত্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের। সে-কথা ভুলতে পারেন না। ডিগ্রী দিয়ে যে কিছু হয় না তা তিনি মানেন তাই বলে

এভাবে লজ্জা দেওয়াটা বরদাস্ত করা যায় না ঠিক। ধরণীধর ছাড়েন না তবুও। মুখের প্রতিটি পেশির কুঞ্চনে কুঞ্চনে ফোটে এক কদর্য হাসি। বলেন, কই অবনীবাবু, কটা পাস করেছেন শুনিয়ে দিন ত।

—আজ্ঞে ইতস্ততঃ করতে থাকেন অবনীবাবু। কম করে বলবেন কিনা ভেবে পান না। এক ঝলক তাকিয়ে দেখেন যোগজীবন ওঁর দিকে। লম্বা রোগা চেহারা। গায়ে একটা ময়লা শার্ট, ময়লা কাপড়, চোখে মোটা কাঁচের চশমা শরীরের আর কোথাও থাকুক বা না থাকুক চশমার পিছনের চোখ দুটোয় দীপ্তি আছে। বলুন লজ্জা কি? পাশ করার চেয়ে অনেক খারাপ কাজ লোকে করে থাকে। বলে ফেলুন।—অবলীলাক্রমে লজ্জা দিতে থাকেন ধরণীধর অবনীবাবুকে।

—আজ্ঞে এম. এ. টা পাস করেছি। কোনগতিকে কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করে দেন অবনীবাবু। ভেবেচিন্তে কম করেই বলেছেন তিনি। জীবনে কোনদিন সম্মান পান নি নিজের বিদ্যার। কিন্তু তাই বলে বিদ্যাকে অপমানিত করতে পারেন না কোনদিন নিজে।

কমটুকু পূরণ করে দেন ধরণীধর —শুধু এম. এ. বলছেন কেন? বলুন যাকে বলে, একেবারে ফার্স্ট কেলাস ফার্স্ট। আর আপনি শশধরবাবু কি একটা ডাক্তারী না কি?—

—আজ্ঞে ডাক্তার নয় ডি-লিট—ডক্টর অব লিটারেচার।

যোগজীবন চেয়ে দেখেন। উদ্ধত স্বর শশধরবাবুর। পরণে খদ্দরের ছেঁড়া পাঞ্জাবী, মাথায় একরাশ তেলহীন চুল। বড় বড় চোখে সোজাসুজি তাকানো। ধরণীধর আর কিছু বলে না শশধরবাবুকে যোগজীবনকে উদ্দেশ করে বলেন, শুনছ, বিদ্যের সব এক একটি জাহাজ। কিন্তু হালগুলি সব ভাঙা। যেটুকু বা বুদ্ধি ছিল, কেতাবের চাপে তাও ওদের মগজ থেকে বেরিয়ে গেছে। হাতে কলম দিয়ে নেহাৎ এই চেয়ারে বসিয়ে রেখেছি তাই, নইলে খোল মাঠে ছেড়ে দিলে চরে খেতে পর্যন্ত পারবে না।

—এঁরাই তাহলে তোমার গ্রামোফোন—তোমার ভাষাকে শুধু একটু মেজে ঘসে শুদ্ধ করে বার করেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ হাসি হেসে মন্তব্য করেন যোগজীবন। তেল মাখানো শেষ হয়েছে ওদিকে। স্টেনো সেক্রেটারীরা উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্যে। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে ওঁদের। বাকী কাজ যা আছে শেষ করতে হবে অফিসে। তাই স্থানত্যাগ করতে হয় ওঁদেরকে। একটু ফাঁকা হতে ধরণীধর প্রশ্ন করেন, তারপর কিছু খবর-টবর আছে নাকি ?

—আছে বই কি ? তা না হলে কি আর শুধু শুধু এলুম। যোগজীবন এতক্ষণে আসল কথায় এসে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।—আজ সকালে গিয়েছিলুম তোমার সেই নিবারণ মিত্তিরের নবজীবন প্রেসে!

—হ্যাঁ, বুঝেছি বল। অনেকগুলো টাকা পাওনা আছে ওর কাছে। আদায় করে নিতে হবে এই বেলা, দিনকাল যা খারাপ হয়ে আসছে! হুঁ ··তা তোমার সঙ্গে আবার সম্পর্ক আছে নাকি ?—

—সম্পর্ক ছিল না আজ নতুন হয়েছে—শত্রুতার সম্পর্ক···আজ সকালেই সেখান থেকে অপমান হয়ে এসেছি!

— অপমান হয়ে এসেছ ? চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল ধরণীধরের।

—হ্যাঁ, আর সেইজন্যই ত তোমায় বলতে এসেছি এ ইলেকশনে দাঁড়াতে পারবো না আমি।—সিগারেট একটা মুখে ধরলেন যোগজীবন।

—এত সব তোড়জোড়ের পর দাঁড়াবে না মানে ? এটা কি ছেলেখেলা ?

—তোমার জন্যেই ত শুধু এতে মাথা গলালুম। কতকগুলো টাকা গচ্ছা গেল···। অপমান হওয়াটা আমার কাছে অন্ততঃ ছেলেখেলা নয়! একটু যেন বিচলিত হন ধরণীধর। এ আবার কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে যোগজীবন ? নিবারণ মিত্তির এমন কি করেছে ? বলেন, কি হয়েছে কি, শুনি না ?

মুখের সিগারেট নামিয়ে নেন যোগজীবন মুখ থেকে। ধরানো

আর হয় না। বলতে হয় আজকের সকালের অভিজ্ঞতার কথা।—জানোই ত পাড়ার মধ্যে ঐ প্রেস! ও-ই যদি বেসুরো আওয়াজ দিতে থাকে তাহলে কাজ চলে কি করে? ওই ত কানাগলির মধ্যে একটা চুনোপুঁটি কাগজ, ভাবলুম ও আর শক্ত কি? ইলেকশন ম্যানিফেস্টোটা ঐখান থেকে ছাপিয়ে নিলেই চলবে! না হয় রেটটা একটু বেশি করে—বুড়ো আঙুলের নখের উপর সিগারেটটা একবার ঠুকে নিয়ে একটু নীরব হলেন যোগজীবন। তারপর বললেন, আজ গিয়েছিলাম কথাটা পাড়তে···চাই কি একটু তোয়াজ করতে·· কাজটা ত হাঁসিল করতে হবে। জলের মতই ত পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে, না হয় আরও কিছু···সমুদ্রে পাত্যার্ঘ....! নখের ওপর সিগারেটের টোকা পড়ল আবার।—কিন্তু তোমার ঐ প্রেসের ম্যানেজার নিবারণ মিত্তির একেবারে জুতো মেরে ছেড়ে দিলে! সঙ্গে একটা ছোকরাকেও দেখলুম, কুঞ্জ না কি নাম···শুনলুম সে-ই নাকি সম্পাদক! সে ছোকরা মন্দ না....কিন্তু তোমাদের ঐ নিবারণ মিত্তির! বললে কি না ছাপতে পারবে না আমার ঐ ম্যানিফেস্টো···সব নাকি মিথ্যে ধাপ্পাবাজি!····

যোগজীবনের ভুরু দুটো আবার বিদ্যুতের মত চকিত হয়ে উঠল। পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে একটা কাঠি নিয়ে ঠুকলেন বারুদের গায়ে। কাঠিটা ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। আর একটা কাঠি বের করলেন যোগজীবন।

স্থির হয়ে রইলেন ধরণীধর। কি যেন ভেবে নিলেন মুহূর্তে। হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে ওসব ভেবো না তুমি! জুতো মেরেছে মারুক! চাঁদির জুতো ফিরিয়ে মারলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না!

ততক্ষণে দেশলাইটা জ্বলে উঠেছে যোগজীবনের। সিগেরটটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, সে হবার নয় হে! সে বড় কঠিন ঠাঁই।

—আচ্ছা, কঠিনকে নরম করবারও ওষুধ আছে।

ধরণীধরের মুখের হাসি ধারালো হয়ে উঠল।

॥ পাঁচ ॥

চিঠিখানা পড়তে পড়তে একটুখানি ম্লান হাসি ফুটে উঠল নিবারণবাবুর মুখে। আজ সকালে লোক মারফৎ চিঠিটা পাঠিয়েছেন ধরণীধর চৌধুরী।

পাশেই বসে ছিল প্রণতি নিবারণবাবুর মুখের ম্লান হাসি দেখে প্রশ্ন করলে, ওটা কার চিঠি বাবা!

—যে চিঠি আসবে বলে আশা করছিলুম। সেই ধরণীধর চৌধুরীর চিঠি! যোগজীবন সমাদ্দারের সেদিনকার সেই চোখ রাঙানী কি ভুলে গেলি মা?

—না বাবা! কিসের জোরে উনি যে দাঁড়িয়েছেন ইলেকশনে তা আর কে না জানে? দেখেছ, ধরণীবাবুর হাতের সবগুলো কাগজে, যোগজীবন সমাদ্দারের নামে কি রকম প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে।

—হুঁ। এদের জন্যেই আমাদের দেশটার সর্বনাশ হয়ে গেল! এতখানি মিথ্যা, এতখানি জোচ্চুরি বোধ হয় অন্য দেশের লোক বরদাস্ত করতে পারতো না। পারে না। আমাদের এই পোড়া দেশে নেতারা যা বলবে তাই একেবারে মহাভারতের মত মেনে নেবে। একটু বিচার করে দেখবে না এর মধ্যে কোন সত্য বস্তু আছে কি না? যাদের মধ্যে সত্যিকারের সিনসিয়ারিটি আছে তাদের কোন স্থান নেই এদেশে। অথচ কাজের সময়, প্রাণ দেবার সময়, জেলে পচবার সময়, তারাই আসে এগিয়ে।

—তাঁরা ত নামডাক চান না। তাঁরা কাজ করতে এসেছেন দেশের জন্য, ত্যাগ-স্বীকার তাঁদের কাছে পবিত্র কর্তব্য। লোকে মান্য করুক না করুক ভোট দিক না দিক, তাঁরা তাঁদের কাজ ঠিক করে যাবেনই।—হাতের মুঠোর মধ্যে কাঁচের পেপার-ওয়েটটা নাড়তে নাড়তে বললে প্রণতি।

—সে কথা ঠিক ! তবে কি জানিস, আজ যখন দেশ স্বাধীনতা পেতে চলেছে তখন আর চুপ করে থাকলে চলে না। ইংরেজকে তাড়িয়ে তার জায়গায় যদি কতকগুলো মুনাফাখোর জোচ্চোরদের দিই বসিয়ে, তাহলে দেশের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। যত ক্ষীণই হোক, নতুন খবর সেই আওয়াজ তুলে যাবে। টাকার লোভ দেখাল যোগজীবন। ডবল রেট, পাঁচগুণ রেট দেবে বলেছিল কিন্তু তবু ছাপতে পারলুম না ওর ঐ মিথ্যায় ভরা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো! ভেবেছিল টাকার লোভে আমার বিশ্বাসকে—আদর্শকে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও বিকিয়ে দেবো আমি! কিন্তু ভুল করেছিল যোগজীবন নবজীবন প্রেসের অবস্থা হয়ত ভাল নয়, মূলধন কম—দেনা রয়েছে বাজারে....দেনা রয়েছে ধরণীধর চৌধুরীর কাছে। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা ত করে যাব।...কুঞ্জবাবু পর্যন্ত মত বদলেছিল ..দোষ নেই....অল্প বয়েস....

—কিন্তু দেনার টাকাগুলোর কি ব্যবস্থা হবে বাবা !—

—একটা কিছু করতে হবে। হয়েও যাবে। তবে ভাবনা হয় বই কি। আদর্শের ওপর বিশ্বাস ছাড়া মূলধন ত কিছু নেই।....এই এতগুলো কমপোজিটার সবাই মিলে টাকা জমিয়ে একটা প্রেস করা গেল। ছোট হলেও এর মূল্য অনেক ! একে রক্ষা করতে হবে বই কি।—একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন নিবারণবাবু। চোখের ওপর একটা পর্দা নেমে আসে অনিশ্চয়তার।

প্রণতি নখ দিয়ে খুঁটতে থাকে পেপার-ওয়েটটা অর্থহীন ভাবে। খানিক পরে বলে, কিন্তু চিঠিটার কথা ত বললে না ?

—ও হ্যাঁ।—ভাবনার ঘুম থেকে উঠে নিবারণবাবু বললেন—চিঠি লিখেছে ধরণীধর চৌধুরী। প্রেসের যন্ত্রপাতি টাইপ ইত্যাদির জন্য কয়েক হাজার টাকা পাওনা আছে ওর, সেগুলো শোধ করে দিতে বলেছে তাড়াতাড়ি....তা না হলে ও নাকি প্রেস তুলে নিয়ে যাবে !

—সে কি? খেয়াল মত তুলে নিয়ে গেলেই হল। কিন্তু দেবার একটা সময় ত আছে?—প্রণতি বিস্মিত ও রাগত স্বরে বলে।

—সেরকম কোন লেখাপড়া ত নেই।

কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল দু'জনে।

খানিক পরে নিবারণবাবু বলে উঠলেন, আমাদের দেশে সবই অদ্ভুত, বুঝলি মা। আমাদের দেশের নেতা হল জনকতক লক্ষপতি কাগজের মালিক। যখন তাদের যা ইচ্ছে তখন জনসাধারণকে দিয়ে তাই বলাচ্ছে। যে নেতাকে ইচ্ছে তুলছে, যাকে ইচ্ছে নামাচ্ছে। যাকে একদিন শ্রেষ্ঠ আসন দিচ্ছে, তাকেই দ্বিতীয় দিনে জুতো মারতে বাকী রাখছে। আর আমাদের অজ্ঞ জনসাধারণ সবই মেনে নিচ্ছে তা নীরবে ওদের মস্ত বড় বাড়ি, মস্ত বড় প্রেস, হাজার হাজার কাগজ বিক্রী—ওদের কথা সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, লোকে চোখ বুজে মেনে নেবে। আর আমাদের এই কানাগলির ভাঙা বাড়ি, নড়বড়ে প্রেস আমরা হাজার বললেও কানে নেবে না কেউ আমাদের কথা....। লোকে মানলে কি হবে, ওরা ত আমাদের কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করবে তখুনি। তা না হলে, যোগজীবনবাবুর ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ছাপাই নি বলে দেখছ না ভেতরে ভেতরে কি রকম ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে ওরা।

—সবই ত বুঝি। কিন্তু ধরণীধর চৌধুরীর টাকাটা ত শোধ করে দিতে হবে। তাতে যদি আমাদের সর্বস্ব দিতে হয় তাও দিতে হবে। একটা কাগজ কলম দে ত জবাবটা লিখে দিই।

—তাই দাও বাবা। বেশ কড়া করেই লিখে দাও, নবজীবন প্রেস টাকার ভয়ে কাবু হয় না। ওরা যে মনে করে টাকা দিতে না পেরে নবজীবন প্রেস ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে তা মস্ত ভুল, সেটা ভাল করে জানিয়ে দাও।

পেপার-ওয়েটটা দুম করে বসিয়ে দিল প্রণতি টেবিলের উপর।

—তাই দিচ্ছি। কিন্তু ধরণীধর কি তাতেও ছাড়বে। অনেকদিন

ধরে সুযোগ খুঁজছে সে 'নতুন খবর'কে টিপে মারতে। এ-পথে সফল না হলে অন্য পথে আঘাত হানবে সে। সামনে বড় দুর্দিন আসছে আমাদের। ভাবছি তাই।

এবার ম্লান হাসিও ফুটল না নিবারণবাবুর মুখে। পিছনের টিনের চালা থেকে মেশিন চলে-ওঠার আওয়াজ ভেসে আসছিল। ঘটাঘট্ ঘটাঘট্। ঘটাঘট্ ঘটাঘট্। টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিলেন নিবারণবাবু হাত বাড়িয়ে।

এতখানি জীবনে প্রচণ্ডতম বিস্ময় অনুভব করলেন নিবারণবাবু পরের দিন সকালে। বেলা তখন আটটা। অন্যদিন এই সময় থেকে শুরু হয় প্রেসের কাজ। আসন্ন নির্বাচনের জন্য বেশি চাপ পড়েছে কাজের। এত সকাল থেকে কাজ করেও কুলিয়ে উঠতে পারা যায় না। আরও লোক চাই। তাই দরজার গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে একটুকরো টিনের সাইনবোর্ড—তাতে লেখা কম্পোজিটার চাই।

রোজকার মতই প্রেসঘরের দরজা খুলে নিবারণবাবু অপেক্ষা করছেন। মনটা অনেকটা শান্ত। গত কালই ধরণীধর চৌধুরীকে জবাব দিয়েছেন। বেশ মিঠে কড়া করেই লিখে দিয়েছেন যে, টাকার হুমকিতে মাথা নীচু করবে না নবজীবন প্রেস কোন দিন। সোনার ফাঁসে কণ্ঠরোধ করা যাবে না কোন দিন নতুন খবরের। প্রয়োজন হয় সর্বস্ব পণ করেই সমস্ত দেনার টাকা শোধ করে দেওয়া হবে। টাকাশোধের ভয়ে প্রেস বিকিয়ে দেওয়া নবজীবন প্রেসের ধর্ম নয়! এই চিঠির জবাবে ধরণীধর অত্যন্ত সহজ সরল ও মোলায়েম করে গুটিকয়েক কথা লিখেছেন মাত্র। তাতে নেই কোন উষ্মা, নেই কোন দম্ভ, নেই কোন চোখ রাঙানী,—শুধু লিখেছেন: আপনার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। আশা করি আপনার সুবিধামত টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

চিঠিটা পেয়ে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন নিবারণবাবু। প্রণতিও

তাই। কিন্তু একেবারে সকল উদ্বেগ দূর হয় নি তাঁর। এই চাল ব্যর্থ হয়েছে বলেই ধরণীধর ছাড়বার পাত্র নন। অন্যপথ, নানা আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ জানা আছে ধরণীধরের। সে পথ হয়ত আরও চড়াই উতরাইয়ে বন্ধুর।

আজকের এই সকালের বিস্ময়, এই উদ্বেগকে মিশিয়েই যেন প্রচণ্ডতর হয়ে দেখা দিল নিবারণবাবুর চোখের সামনে ··এতদিন ধরে এই কানাগলির এক প্রান্তে বসে বহু আশার, বহু স্বপ্নের আভাস দেখে আসছেন তিনি। সকাল আটটায় মেশিন চলার প্রথম আওয়াজ বিচিত্র এক ধ্বনির তরঙ্গ তুলে আসছে তাঁর হৃদয়ে। আজ এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটল। আজ ঐ কানাগলিকে মনে হল দুস্তর মরুর মত ধূ ধূ, মেশিনের নিস্তব্ধতা মস্ত এক ভারি পাথরের মত চেপে বসল তাঁর মনে। আজ নেই কোন লোক, নেই কোন মেশিনের শব্দ। প্রণতিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মেশিনের আওয়াজ না শুনতে পেয়ে ভেতর থেকে, তাই ও ছুটে এল বাবার কাছে, ম্যানেজারের ঘরে। আশ্চর্য, ঘরের মধ্যে একা বসে নিবারণবাবু, দৃষ্টি তাঁর শুধু সামনের পথটার দিকে। সে ঘরে আর কেউ নেই—নেই কুঞ্জ, নেই সাতকড়ি, মনোহর, বলাই···প্রেস ঘরে নেই একজনও মেশিনম্যান!

—ব্যাপার কি? কেউ আসে নি কাজে?

—না। প্রণতির দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন নিবারণবাবু।

—সে কি? আজকে ত ছুটি নেই? অনেক কাজ যে বাকী!

—ছুটি নেই, কিন্তু ছুটি ওরা করিয়ে নিয়েছে।

—তুমি কি বলছ বাবা?—প্রণতি উত্তরোত্তর বিস্ময়ে অসহ্য বোধ করে।

নিবারণবাবু এতক্ষণে তাকিয়ে দেখলেন প্রণতির দিকে। বললেন, তোকে বলেছিলুম ধরণীধর চৌধুরী অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

অনেক পথ, অনেক বাঁকা পথ জানা আছে তার···। সে চায় আমাদের প্রেসকে, আমাদের কাজকে অচল করে তুলতে—

—তুমি বলতে চাও যে ধরণীধর চৌধুরী পেছন থেকে এই ধর্মঘট করিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

দরজার বাইরে গলার আওয়াজ পেয়ে প্রণতি চেয়ে দেখল। প্রতিদিনের পরিচিত কণ্ঠস্বর যেন শোনা যাচ্ছে বলে মনে হয় ?···ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে গলির দরজায় এসে দাঁড়াল প্রণতি বাইরে দাঁড়িয়ে প্রেসের ধর্মঘটী কর্মচারীরা। নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ওরা, প্রণতিকে দেখে থেমে গেল। ওরা আশা করছিল প্রণতি হয়ত কিছু বলবে ওদেরকে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রণতি একটি কথাও বললে না। এক আজব দৃশ্য দেখছে যেন এমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীরবে। ওদের এই বিস্মিত ভীড়ের মধ্যেও আর একটি বিস্ময় ছিল লুকিয়ে। প্রণতির দৃষ্টি সেটুকু এড়ায় নি। সে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছিল বহু পরিচিত লোকগুলোর মাঝে নতুন এক মানুষকে। কিছুক্ষণ আগে এই লোকটিকেই যেন বাইরের দরজার কাছে দেখেছিল। 'কম্পোজিটর আবশ্যক' লেখা বোর্ডটির দিকে লোকটি দেখছিল একমনে। কম্পোজিটরীর উমেদার ভেবে লোকটিকে সে জানিয়ে এসেছিল যে কম্পোজিটর আর তাদের দরকার নেই। কে এ ? কেন এসে দাঁড়িয়েছে এদের সঙ্গে ? এ ও কি ধরণীধরের কারসাজি ? প্রণতির নীরব দৃষ্টির মাঝখানে নিবারণবাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রণতি লক্ষ্য করে নি।

—এই যে নিবারণদা—ভীড়ের মাঝ থেকে ডাক শুনে প্রণতি ঘুরে দেখল তার বাবা এসে দাঁড়িয়েছে।

মনোহর বলে উঠল—শোন নিবারণদা আমরা আজ থেকে ধর্মঘট করব ঠিক করেছি—

—কারণ ?

—আমরা টাকা চাই ; তোমার ওসব কো অপারেটিভ স্কীম ম আমরা বুঝি না—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ওসব ফাঁকিবাজিতে আর আমরা ভুলছি না—টাকা চাই আমাদের—ও সব ভাঁওতা অনেক হয়েছে, এখন আর চলবে না—

একসঙ্গে অনেকগুলো গলা কোলাহল করে উঠল।

ঠিক এই সময়েই দেখা গেল কুঞ্জ মজুমদার ছুটতে ছুটতে আসছে। —ব্যাপার কী, ব্যাপার কী, এত গণ্ডগোল কিসের ?—বলতে বলতে কুঞ্জ এসে দাঁড়ায় নিবারণবাবুর পাশে।

—আমরা কাজ করবো না—আমাদের দাবি মেটাও আগে—ও সব ভাঁওতা চলবে না—আবার ঝড় উঠল একটা মিশ্রিত স্বরের।

রেগে যেন আগুন হয়ে উঠল কুঞ্জ। বললে—একেবারে মেছোহাটা বানিয়ে তুলেছ যে তোমরা। যা বলবার ভেতরে এসে ভাল করে বলা যায় ত!

—না না আমরা যাবো না—আমরা কাজ করবো না—ভাল চাও ত আমাদের কথা শোন—আবার কোলাহলের ঝঞ্ঝা!

—আবার হট্টগোল হচ্ছে! কুঞ্জ যেন মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর নিবারণবাবুর দিকে ফিরে বললে, আপনি তাই সহ্য করছেন, আমি হলে—উত্তেজনায় কথাটা শেষ করতেই পারলে না কুঞ্জ।

—আপনি হলে কি করতেন আমরা তা জানতে চাই নি কুঞ্জবাবু. আমরা শুধু নিবারণদা কি করবেন তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

থতমত খেয়ে গেল যেন কুঞ্জ। অবাক হয়ে দেখল সেই বলাই ঘোষ। যে কুঞ্জর কলমের খোঁচায় আগুন জ্বলে সেই কুঞ্জর মুখের দিকে তাকিয়ে যে বলাই কথা বলতে পারতো না—সেই বলাই।

কুঞ্জ একেবারে রাগে জ্বলে উঠল।—বেশ নিবারণবাবুই তোমাদের কথার তাহলে জবাব দিন। আমি চললাম।

কুঞ্জকে চলে যেতে দেখে ওরাও যেন চুপ হয়ে পড়েছিল। তারই

মধ্যে নিবারণবাবুর গলা শোনা গেল—কি তোমাদের নতুন প্রস্তাব তাহলে বল।

কে বলবে কথাটা তাই নিয়ে একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখা যায় ওদের মধ্যে। শেষটা বলে মনোহর,—প্রস্তাব আমাদের সোজা—ফেলো কড়ি মাখো তেল, এই আমরা বুঝি। আর একজন বলে, ওসব মিনি মাগনা আমরা খাটতে পারবো না।

—মিনি মাগনা এতদিন তোমাদের খাটিয়েছি বলে কি তোমাদের ধারণা? মন্থর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন নিবারণবাবু।

—শোন নিবারণদা—বলাই এগিয়ে এসে বেশ শান্ত সুরে বলে—কথাটা আমি পরিষ্কার করে বলি। সবাই মিলে নিজেদের প্রেস গড়ে তুলবে, নিজেরা তার লাভ লোকসানের অংশীদার হবে, ওসব ওরা বোঝে না। তুমি যদি আর সবাইকার মত মজুরী আর মাইনের ব্যবস্থা কর, ওরা ধর্মঘট ছেড়ে কাজ করতে রাজী। পেছন থেকে ফোড়ন দেয় সাতকড়ি—তাই কর না দাদা, কাজ কি এ সব ঝামেলায়! ষষ্ঠী বলে—হ্যাঁ আমরা কাজ করবো মজুরী নেবো, ব্যস্! তোমার প্রেস তোমারই থাক।

ভাল ভাবেই জট পাকিয়েছে ধরণীধর চৌধুরী। ঝুনো গাছের শিকড়ের মত বিস্তার এর। তাই একটুখানি নীরব থেকে চিন্তা করেন নিবারণ। সামনের ঐ কানাগলির দিকে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। আগে আগে তাঁর দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো এক বিভিন্ন রূপের পৃথিবী। তাঁর স্বপ্নে গড়া দেশ···। ··আজ আর যেন কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু ঐ স্যাঁৎসেঁতে গলির দুপাশ ঘিরে পুরানো ইঁট বার করা দেওয়াল। আর তারই মাঝে উদ্ধত ঐ জনতা—বিভ্রান্ত, বিপথ চালিত।

নিবারণবাবু শুরু করলেন—তোমাদের সব কথাই শুনলাম। নিজেই প্রেসের মালিক হয়ে বসে, মাইনে দিয়ে তোমাদের রাখতে পারলে যে সব ঝামেলা চুকে যায় তা আমি জানি—কিন্তু তোমরাও

জানো, আমার সারা জীবনের সঞ্চয় ক্ষুদ কুঁড়ো যা ছিল তা সবই ঢেলে দিয়ে তোমাদের সাহায্য নিয়ে কোন রকমে ধার করে এ প্রেস আমি শুরু করেছি। বাজারে আমাদের এখনো অনেক দেনা। তোমাদের মাইনে এখুনি চুকিয়ে দিতে পারি এমন কোন আলাদা সম্বল আমার নেই। তাছাড়া নিজে মালিক হব, নবজীবন প্রেস এ উদ্দেশ্য নিয়ে ত আমি শুরু করিনি ভাই! তোমরা সবাই জানো যে আমি নিজে তোমাদের মত কম্পোজিটরই ছিলাম, এখনো আছি। অনেক দুঃখ পেয়েছি, অনেক অবিচার অত্যাচার সয়েছি; সম্মান দূরে থাক, নিজেদের ন্যায্য পাওনা থেকেও চিরকাল বঞ্চিত হয়ে এসেছি। তাই বড় সাধ ছিল যে, সত্যিই নিজেদের রক্ত জল করে যারা কাজ করে, তাদের নিজস্ব সকলের একটা প্রেস কোন মতে গড়ে তুলবো···যেখানে নিজেদের কাজের ষোল আনা দাম সবাই পাবে। মাথা নীচু করে কাউকে থাকতে হবে না। এই স্বপ্ন নিয়েই নবজীবন প্রেস আর 'নতুন-খবর' কাগজ শুরু করেছিলাম। তোমাদেরও ডেকেছিলাম তার ভাগীদার হতে। আজ তোমরা ছেড়ে চলে গেলে, নবজীবন প্রেস আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে আমি জানি, তবু আমি নিরুপায়।—কথার শেষে গলা তাঁর ভারি হয়ে উঠল। বলাই, সাতকড়ি, ষষ্ঠী···ইত্যাদি প্রায় সকলেই মাথা নীচু করল কথা শুনে। কেবল মনোহর চেঁচিয়ে উঠল, উপায় আমাদেরই বা কি আছে শুনি! কবে গাছ বড় হয়ে ফল ফলবে সেই আশায় কতদিন বেগার খেটে মরবো! না হে না, বেকুবী যা করবার করেছি, আর নয়!

কে একজন বললে পেছন থেকে—হ্যাঁ, আমাদের সকলের এক কথা মাইনে দিয়ে রাখতে পার থাকব, নইলে চললাম!

মনোহর গলাটা আরও একটু উঁচু করে হাত নেড়ে বলে উঠল—চল হে চল··সোনা নয়, রূপো নয়, সীসে····সীসে যে চেনে তার আবার কাজের ভাবনা—! সত্যি সত্যিই মনোহর হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল সকলকে। এগিয়ে চলে গেল সকলে বাইরের দিকে।

সবার শেষে গেল ষষ্ঠী, সাতকড়ি, বলাই। ধীরে ধীরে সকলে বেরিয়ে গেল গলি থেকে। নিবারণবাবুও ফিরছিলেন ভেতর দিকে, প্রতিমা বিসর্জনের পর যে মন নিয়ে বাড়ী ফেরে লোকে। হঠাৎ গলির মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভীড়ের মধ্যে এই মুখটিই আকর্ষণ করেছিল প্রণতিকে খানিক আগে। আর তার মনকে দুলিয়েছিল যথেষ্ট সন্দেহে।

—তুমি! তুমি কি চাও?—নিবারণবাবু প্রশ্ন করলেন।

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।—একটু হাসি মেশানো স্বরে জবাব এল।

—আমার যা বলবার ছিল সবই ত শুনেছ! এর পর আর কি জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?—একটু যেন শুকনো স্বরেই বললেন নিবারণবাবু!

—সব শুনেছি বলেই ত দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি এ প্রেস আপনি তুলে দেবেন?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে বক্তার চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন নিবারণবাবু! সারাদিনের মধ্যে এই বোধ হয় এতটুকু আলো দেখলেন তিনি! বললেন, না দিয়ে উপায় কি?

—কেন! শহরে ওই কজন ছাড়া আর কি কম্পোজিটর নেই? যে আদর্শ নিয়ে আপনি প্রেস শুরু করেছিলেন, তাতে বিশ্বাস করবার মত লোক কি একেবারে দুর্লভ?

চমকে উঠলেন নিবারণবাবু! সকালের এক বিস্ময় আর এখনকার এই আর এক! সব চেয়ে কম চেনা এই মানুষটি এতদিনের সঙ্গী সাথীর চেয়েও আপন করে কথা বলে কেন? বললেন, তুমি বিশ্বাস করো?

—নিশ্চয়ই করি।—দ্বিধাহীন কণ্ঠ শোনা গেল।

—কিন্তু একলা তোমায় নিয়ে ত প্রেস চলবে না?

—কেন চলবে না! এই এক থেকেই এক সহস্র হয়ে দাঁড়াবে না,

আপনি কেমন করে জানলেন! সত্যিকার যা বড় কাজ, তা কতজন মিলে শুরু করল তা ত বড় কথা নয়!

—তোমার কথা শুনে বড় খুশি হলাম বাবা! কি নামটি তোমার?

—জয়ন্ত!

—তুমি কি সত্যি কাজ করতে চাও?

—হ্যাঁ চাই, এখুনি করতে চাই!

—কিন্তু কাজ যে অঢেল! কি কাজ যে তোমায় দেবো বুঝতে পারছি না!—নিবারণবাবু কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করতে থাকেন!

এতক্ষণ আর একজোড়া দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ঘিরে রেখেছিল জয়ন্তকে। সে দৃষ্টি এতক্ষণে কথায় প্রাণ পেল। বললে প্রণতি,—উনি প্রেসের কতদূর কাজ জানেন, জিজ্ঞাসা কর না বাবা! কথা শেষ করে প্রণতি এক ঝলক তাকিয়ে নিল জয়ন্তর দিকে। তাকিয়ে যেন লজ্জা পেল। এঁকেই না লোক চাই-না বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে!

- না না সে সব কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না—বলে চলল জয়ন্ত একবার প্রণতির দিকে তাকিয়ে নিয়ে—জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার নেই! কাজটা ত বড় নয় বড় হল কাজের ইচ্ছা!

এলোমেলো কথা হলেও তার মধ্যে প্রতীতি অসামান্য!

—তাহলে জয়ন্তকে একটু ওদিকের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয় মা! আজকের জরুরী কাজটা কম্পোজ করুক। কপি তো ওখানেই আছে!—নিবারণবাবু এক কথায় আদেশ করে বসলেন। কম্পোজ করতে হবে!—গলার স্বরে ও চোখের দৃষ্টিতে আশঙ্কা ফুটল জয়ন্তর।

—হ্যাঁ, তুমি যে বললে এখুনি কাজ করতে চাও! আগে ত কম্পোজ করতে হবে!

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কাজ করতে চাই—আবার উৎসাহিত হয়ে উঠল জয়ন্ত আগের মত!—তাহলে আসুন আমার সঙ্গে কম্পোজ-ঘরে।—প্রণতি বেশ সপ্রতিভ হয়ে ডাক দিল ওকে।

—হ্যাঁ, এই যে যাই।—একটু যেন ত্রস্তপদে এগিয়ে গেল জয়ন্ত ওর পিছনে।

যেতে যেতে মনে হল জয়ন্তর, যেন সেই অরণ্যে প্রবেশ করতে চলেছে, যার ভেতর থেকে মুক্তির পথ আজও রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত। এতখানি অনিশ্চয়তা তার মনের মধ্যে। লেখক সে নিজে। তাদের গ্রামের কাগজে কত লেখা বেরিয়েছে তার। কাগজের অফিসে বসে আওয়াজ শুনেছে ফ্ল্যাট-মেশিনের। কিন্তু সেই মেশিনের খুঁটিনাটি কাজের যে অভ্যাস ও কুশলতার প্রয়োজন সে সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেখে নি কখনও। কাজেই উৎসাহ যেন নিভে যাচ্ছিল জয়ন্তর।

অল্প কয়েক হাত পথ। সেটুকু পেরিয়েই প্রণতি ওকে কম্পোজ-রুমে নিয়ে ঢুকল। ঘরের মধ্যে কেসের পর কেস সাজানো রয়েছে·· কত রকমের টাইপ, লেড্ ইত্যাদি। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল না' আলো জ্বালল প্রণতি।

প্রণতিকেও লক্ষ্য করছিল জয়ন্ত। কি অবাধ সহজ সরল গতিভঙ্গি প্রণতির মুক্ত বিহঙ্গের মত!—এই বুঝি আপনাদের কম্পোজ সেকশন। বাঃ, বেশ ত! কথা বলাতে চাইল জয়ন্ত প্রণতিকে।

হ্যাঁ। বেশ আর কই? এতে কাজ কুলিয়ে ওঠে না।·· নিন আপনি যেটায় খুশি বসে কাজ করতে পারেন।

এত সহজে কাজের কথায় নেমে এল প্রণতি! জয়ন্ত যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটায় খুশি বসলেই হল! আমার কাছে সব সমান।—আলোর নীচের জায়গাটায় বসে পড়ল জয়ন্ত। —আচ্ছা এখন আপনি যেতে পারেন। আর কিছু আমার দরকার হবে না।—কথায় আর অঙ্গহেলনে তৎপরতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল জয়ন্ত।

—সে কি! অবাক হল প্রণতি—কপিই যে আপনাকে দেওয়া হয়নি!

—কপি! ও হ্যাঁ, তাও ত বটে! কপিই ত দেওয়া হয় নি! তবে কি জানেন, কপি ছাড়াই আমার চলে যায়। কথার মধ্যে সংলগ্নতা হারিয়ে ফেলল জয়ন্ত তাড়াতাড়িতে। ক্রমশঃই বিস্ময় বাড়ছে প্রণতির!—কপি ছাড়াই চলে যায়! কপি না হলে কি করে কম্পোজ করেন?

—মানে ওই কপিই কম্পোজ করি, তবে কি বলে, মুখস্থ হয়ে যায় কি না, তখন কপি আর দেখবার দরকার হয় না। জয়ন্ত একটা মিথ্যে সামলাতে দশটার জালে জড়িয়ে পড়ে।

—ও তাই বলুন!—খানিকটা যেন আশ্বস্ত হয় প্রণতি। আপনার স্মরণশক্তি বুঝি খুব বেশি?

—দারুণ!—চোখ বড় করে বড়াই জানায় জয়ন্ত।

—কিন্তু এ ত আপনার মুখস্থ জিনিস নয়—নতুন কপি! সুতরাং কপি ছাড়া চলবে না, তবে অনেকখানি আছে। এ বেলায় কি পারবেন?

—পারি কি না, দেখি না চেষ্টা করে। কই দেখি আপনার কপি—জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে দেয় প্রণতির দিকে।—'সাবধান'—শিরোনামা দেওয়া কুঞ্জ মজুমদারের লেখাটা হাতে করে এনেছিল প্রণতি। জয়ন্তর হাতে তুলে দেয়। জয়ন্ত হাসে। বলে, গোড়াতেই সাবধান!

প্রণতিও হাসে। প্রণতির এই প্রথম হাসি জয়ন্তর সামনে। —আচ্ছা, আমি এখন আসি। কম্পোজ করুন বসে বসে। ষোল এম্ ডবল কলম হবে কিন্তু।

—ষোল এম্ ডবল কলম! কতকগুলো দুর্বোধ্য শব্দের মত উচ্চারণ করে জয়ন্ত কথাগুলো আবার যেন শুনতে চায়।

—হ্যাঁ, ষোল এম্ ডবল কলম।—অনায়াস ভঙ্গিতে বলে প্রণতি।

—ওঃ তাই বলুন, ষোল এম্ ডবল কলম। হ্যাঁঃ, ভারি ত ষোল

এম্ ডবল কলম। আপনি কিছু ভাবেবন না। ষোল এম্ ডবল কলম একেবারে। ষোলর জায়গায় পনের হবে না।

লোকটা পাগল নাকি? একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় প্রণতি একবার জয়ন্তর দিকে। তারপর বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

অনাবিষ্কৃত পথ অরণ্যের স্বাদ অনুভব করতে শুরু করে জয়ন্ত

তার চোখের সামনে যেন এক সীসের জগৎ। এক একটা টাইপ তুলে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করে জয়ন্ত। বার দুয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঠোদ্ধার করে টাইপগুলোর। একা 'ক' নিয়েই কি বিপদ। ক আছে, ক'য়ে উ আছে, ক'য়ে ঋ'ফলা আছে, ব'ফলা···। কপালে ঘাম দেখা গেল জয়ন্তর। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখল—নাঃ পাখার নামগন্ধ নেই সেখানে —ষোল এম্ ডবল কলম। মুখ দিয়ে আবার উচ্চারণ করে শুনলো জয়ন্ত নিজের কানে, যদি তার কোন রকম অর্থ স্পষ্ট হয়ে আসে তার কাছে। না, অসম্ভব কম্পোজিটারীর চাকরিটা নেহাৎ সইল না বরাতে! একটা হাই তুলে হাল ছেড়ে দিল জয়ন্ত।

চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ও অক্ষরগুলোর দিকে। নিশ্চিন্তে এক একটি খোপে ঘুমিয়ে আছে তারা। যারা নতুন, তারা আলো পেয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। কোন্ সে জাদুকর যার এই মন্ত্র—ষোল এম্ ডবল কলমের মন্ত্র জানা আছে, তার স্পর্শে এই অক্ষরগুলো হয়ত সজীব হয়ে উঠত। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যেত সৈনিকের মত। তারপর? তারপর শুধু আগুন ··বহ্নিকণা!

নিজের ছাপা অক্ষরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল জয়ন্তর! এই ষোল এম্ ডবল কলমের মন্ত্র জানা জাদুকরের হাতেই ত সেগুলো প্রাণ পায় না হলে, কে খবর রাখত জয়ন্তর একসারসাইজ-বুকে পার্কার কলমের আঁকিবুকি। নিজের লেখাগুলো যেন নতুন এক পরিচয় নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর চোখের সামনে। কত রচনা মনে আসতে লাগল ওর···উঃ লেখার কাজ পেল না কেন সে! সে যে

সেনাপতি নয়—তাইতো এই ঘুমন্ত সৈনিকের দল চুপ করে আছে ঘুমিয়ে।···বড় অসহায় বোধ হতে লাগল ওর।

চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে কুঞ্জ মজুমদারের হাতের লেখা—'সাবধান'! মনে মনে পড়ে চলে বেশ খানিকটা লেখা। জোরালো ভাষা, সংযত প্রয়োগ নৈপুণ্য। কার লেখা কে জানে? ঐ নিবারণ-বাবুর কি? না কি ঐ সহজ সরল-স্বচ্ছন্দ-গতি মেয়ের?

ঘরের বদ্ধতায় হাঁপিয়ে উঠল জয়ন্ত। একটা টাইপও সাজাতে পারেনি ও এখানে। পারবেও না নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতে। উঃ কী ভাবে যে জড়িয়ে পড়ল ও এই প্রেসের সঙ্গে! গোলমাল শুনে এসেছিল ব্যাপারটা কি তাই জানতে! এসে যা শুনল অবাক হয়ে গেল—অবাক হয়ে গেল নিবারণবাবুর কথার ঔজ্জ্বল্যে। এত বড় আদর্শ, এত মহান একটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে সহযোগিতার অভাবে! মনটা হঠাৎ নড়ে উঠেছিল জয়ন্তর।···তারপর ঐ সহজ সরল মেয়ের পথ দেখানো এই অনাবিষ্কৃত-পথ অরণ্য আর আর এই যোল এম্ ডবল কলম। জয়ন্ত টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পালিয়ে যাবে না কি সে? না পালিয়ে আর উপায় কি? কম্পোজ ছাড়া কি আর কোন কাজ ছিল না প্রেসে? নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছিল জয়ন্ত কম্পোজ ঘর থেকে। সামনেই প্রণতিকে দেখে প্রায় চমকে দাঁড়িয়ে গেল!

—জয়ন্তবাবু! প্রণতি ছোট করে ডাকল। ডাকবে বলেই আসছিল প্রণতি, তাই ডাকল। কিন্তু তার আগে তারও চমক লেগেছিল। তারই জের টেনে বিস্ময় প্রকাশ করল সে—ও কি চলে যাচ্ছেন?

—না না যাচ্ছি না! মানে—এই বড্ড দেরী হয়ে গেছে কি না! তাই ভাবছিলাম এবেলা না হয় বাড়ী থেকে ঘুরে আসি!

—বাড়ী থেকে ঘুরে আসবেন! কতক্ষণে?—বিরক্ত হয়েই বললে প্রণতি।

—কতক্ষণে আর ? এই ত যাবো আর আসবো !

—ও, বাড়ি আপনার কাছেই বুঝি !

—কাছেই।—সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে কি ভেবে আবার জয়ন্ত এগিয়ে গেল। বলল—না না কাছে ঠিক নয়···বেশ দূর মানে সেই বাদামতলা !

—বাদামতলা ! চোখ বড় হল প্রণতির !

—হ্যাঁ, হাওড়ার বাদামতলা !

—তবে যে বললেন, যাবেন আর আসবেন ?

জয়ন্তর হৃদয়ঙ্গম করতে দেরী হল না, যে বেশ শক্ত পাল্লায় পড়েছে সে ! কিন্তু অপ্রতিভ হল না সে। বললে,—হ্যাঁ, ঠিকই ত যাব আর আসব ! তবে এবেলায় আর আসা হবে না বোধ হয়।

—তাহলে ওবেলায় আসছেন ত ঠিক ?—ব্যস্ততা ফুটে উঠল ওর স্বরে।

—হ্যাঁ সে আর বলতে। কাজ যখন নিয়েছি—আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার !

পালিয়ে বাঁচল এমন ভাবে হন-হন করে চলে গেল জয়ন্ত। নিবারণবাবু এসে পড়েছিলেন ঠিক ঐখানেই। জয়ন্তকে চলে যেতে আবছা দেখেছিলেন তিনি। তাই প্রশ্ন করলেন প্রণতিকে,—জয়ন্ত-বাবু চলে গেলেন নাকি ?

—হ্যাঁ বাবা, বললেন ওবেলায় আসবেন !—জয়ন্তর কথায় যে ওর বিশ্বাস আছে, সে কথা ওর স্বরে প্রকাশ পেল।

—ওবেলায় আসবেন। ক্ষুণ্ণ হলেন নিবারণবাবু। তা' তুই কোথায় যাচ্ছিস মা ?

—এই সামনের বাড়িতেই বাবা। কালকে বললুম না যে, কারা যেন নতুন এসেছে ও-বাড়িতে। একটা ছোট্ট মেয়ে আর তার দাদা। দাদাকে দেখি নি অবশ্য এখনও, মেয়েটি কিন্তু বেশ মজার। ছোট্ট মেয়ে, আর কোন বড় মেয়েমানুষ নেই বাড়িতে, ঝি চাকর

দিয়ে আর কত করবে বলো? তাই একটু খাবার দিয়ে আসতে যাচ্ছি!

ছোট্ট মেয়ের প্রতি অদেখা-স্নেহ জাগল নিবারণবাবুর চোখে। প্রণতি আর দাঁড়াল না, ভেতর থেকে চট করে একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে এসে বেরিয়ে গেল। জয়ন্ত এসে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে। ভেতরে যায় নি তখনও। হঠাৎ প্রণতিকে আসতে দেখে সত্যিই থতমত খেয়ে গেল। প্রণতিও ছাড়ল না। মনে মনে প্রশ্ন করল—এখানে এ কেন? মুখে বললে, এ কি আপনি এখনও বাড়ি যান নি? এখানে কি করছিলেন?

—না এই মানে·· এই একটু বাড়ীটা দেখছিলুম!

—না না আর দেরী করবেন না। কমখানি ত পথ আপনাকে যেতে হবে না। সেই হাওড়ার কোথায় যেন বললেন?

কি বলেছিল সে? জয়ন্ত ভেবে দেখল এক মুহূর্ত। মনে এল কি একটা তলা যেন তখন বলেছিল। দেরী করলে চলে না। তাড়াতাড়ি বলে—পঞ্চাননতলা!

—আপনি যে বললেন—বাদামতলা!—ছাড়বার পাত্র নয় প্রণতি। স্মরণশক্তি ওর নিদারুণ!

—ওই মানে · তার মানেই তাই·· যেখানে বাদামতলা সেখানেই পঞ্চাননতলা। বাদাম-গাছের নীচেই পঞ্চাননঠাকুর কি না!

—ওঃ তাই বুঝি! কিন্তু একটু কাছাকাছি কোথাও চেষ্টা করলে কি বাসা পাওয়া যায় না?

—চেষ্টা কি আর করি নি। কিন্তু জায়গা কি আর শহরে কোথাও আছে?

—এতক্ষণে একটা জুৎসই আলোচনা পেয়ে আশ্বস্ত হল জয়ন্ত।

—তা সত্যিই।—চিন্তিত দেখাল প্রণতিকে।—এদিকে লোকের মাথা গোঁজবার জায়গা নেই, অথচ দেখুন এই এতবড় বাড়িতে মানুষের অভাবে ঘরগুলো খাঁ খাঁ করছে। থাকবার মধ্যে একটি

ভাই আর বোন! তা ভাইটির আবার এমন দায়িত্বজ্ঞান, যে এতটুকু বোনকে একলা রেখে সারাদিন যে কোথায় থাকেন পাত্তাই নেই।—সেই ছোট্ট মেয়ের প্রতি স্নেহের আবেগে বলে চলল প্রণতি। হাসি পেয়ে গেল জয়ন্তর। ইচ্ছে হল বলে, পাত্তা আর থাকবে কি করে, যে পাল্লায় পড়েছে সকাল থেকে, তাতে অস্তিত্ব নিয়েই টানা-টানি! মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন রেখে মুখে খুব দরদ দেখাল জয়ন্ত। বললে—খুব ...খুব অন্যায় ত!

—নিশ্চয় অন্যায়।—সহানুভূতিতে আরও প্রগল্‌ভ হল প্রণতি। —আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের একবার দেখা হলে এমন শুনিয়ে দিতাম।

—তা শুনিয়ে দেওয়াই উচিত, কিন্তু আপনার হাতে ওটা কি? ইচ্ছে করেই কথাটা ঘুরিয়ে দিল জয়ন্ত।

—কিছু নয়, সামান্য একটু খাবার। কি করি বলুন, ওইটুকু মেয়ে, ওকি আর একলা সব পারে? তাই একটু তরকারি নিয়ে যাচ্ছি!

—তরকারি আবার কেন? নিজের অজান্তেই বলে ফেলল জয়ন্ত মুহূর্তের জন্যে সে বোধ হয় তার বর্তমান অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিল। পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে উঠল সে। বললে, আমি বলছিলুম কি, যে ওরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন ভদ্রলোকের জন্যে কিছু না করাই উচিত!

—তা কি করব বলুন। তাঁর জন্যে ত নয়, তাঁর ছোট বোনটির জন্যেই করি কিন্তু আপনি আর দেরী করবেন না!—

মনে মনে আরও খানিকটা হাসল জয়ন্ত। খানিকটা যেন বেদনাও খোঁচা দিল মনের আর একদিকে, অকারণে। কিন্তু আর দাঁড়াল না। বললে, আচ্ছা আসি। বলেই চলে গেল ওখান থেকে।

॥ ছয় ॥

খানিকটা এলোমেলো ঘুরে এল জয়ন্ত। ওই মেয়েটার কাছে পরাজিত হওয়ার চেয়েও সামান্য কম্পোজিটরীর কাজ করতে না পেরে বেশি যেন পরাজিত মনে হচ্ছে তার নিজের কাছে নিজেকে। কোন কাজ না পেরে পালিয়ে আসা এই বোধ হয় তার কাছে প্রথম। কিন্তু পালাতে পারে নি জয়ন্ত। ধরা পড়ে গেছে, আর কেউ নয় ঐ প্রণতির কাছেই। অবশ্য তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে বেশি সময় লাগে নি ওর। অনর্গল বানানো কথা বলে চলেছে। বাদামতলা, পঞ্চাননতলা আরও কত কি, এখন হয়ত সে নিজেই মনে আনতে পারবে না সে কথা। যখন বলেছিল তখনও মন ছিল না ঠিক। মনটা ছিল আর এক দিকে—ঐ প্রণতির মনের দিকে, যে দিকটা এড়াতে পেরেছে কি না সে, সে-বিষয়ে এখনও তার যথেষ্ট সন্দেহ। তাই পথে পথে ঘুরে, এলোমেলো পা চালিয়ে মনটা একটা কাঁটায় স্থির করবার চেষ্টা করছে জয়ন্ত। খুব জোড়ে দৌড় লাগানো মোটরের স্পীডোমিটারের কাঁটার মতই কাঁপছে সে কাঁটা। থর থর করে কাঁপছে। ষোল এম্ ডবল কলম....ষোল এম্ ডবল কলম···। মাথার ভেতর ঝিঁ ঝিঁ করছে জয়ন্তর। শির শির করছে হাতের আঙুল। মনে হচ্ছে একটা কাগজ কলম নিয়ে বসে যায় এই মুহূর্তে....তারপর লিখে চলে তরতর করে। কি লিখবে সে? কিছু একটা নিশ্চয়···। তার ছন্দ যেন ঝম্ ঝম্ করছে মাথার মধ্যে। কিন্তু ষোল এম্ ডবল কলম? সেই শাদা-কালোর আঁচড়কে আগুন করে জ্বালিয়ে তোলার মন্ত্র? সে মন্ত্র কি কেউ বলে দেবার নেই? অনেক ঘুরে ঘুরে আর অনেক ভেবে ভেবে শেষটা জয়ন্ত বাড়ি ফিরল। তখন আর প্রণতি নেই ওখানে। যাক আশ্বস্ত হল জয়ন্ত। কেন

জানি না, গোড়া থেকেই নিজের পরিচয়টা গোপন রাখবার একটা নেশা যেন পেয়ে বসেছে জয়ন্তকে। সে এখন শুধু কম্পোজিটার—নিত্যন্তই প্রেসের কর্মচারী। তবু সন্দেহ হয় জয়ন্তর। যে দিকটা এড়ানো যায় নি বাদামতলা-পঞ্চাননতলার কৃত্রিমতা দিয়ে সেই দিকটার কথা মনে সন্দেহ আনছে ওর। ইচ্ছে করেই আবার ফিরে গেল জয়ন্ত নবজীবন প্রেসে। কেউ জানল না সকালে পালিয়ে আসার সময় যে জেনেছিল সে-ও নয়। কম্পোজ-রুমে গিয়ে বসল ও আগের জায়গায়—ষোল এম্ ডবল কলম···ষোল এম্ ডবল কলম। কিছুতেই পনেরো হবে না। ষোলই হবে। আর একবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চেষ্টা শুরু করল জয়ন্ত।

ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল ছোটেলাল—নবজীবন প্রেসের জমাদার। অদ্ভুত মানুষ এই ছোটেলাল। দেহাতী লোক, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে কিন্তু সে-ই আবার চরম ভাঙনের দিনে নিবারণবাবুর পাশে এসে দাঁড়ায়। এই নবজীবন প্রেস যখন নিবারণবাবুর কল্পনারাজ্যে তখন থেকেই ছোটেলালের সঙ্গে যোগাযোগ। আজ তাই অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেন নিবারণবাবু, ছোটেলাল না থাকলে এ প্রেস হয়তো গড়েই উঠতো না কোন দিন।···একদিকে আছে কুঞ্জ তার চাবুকের মত কলম নিয়ে আর অন্যদিকে ছোটেলাল। এরা যেন এক নদীর দুই পারের মত। এই দুই পারের কোল দিয়ে বয়ে যায় নদী জোয়ার-ভাঁটায়। ছোটেলাল ছুটি নিয়েছে তাই বুঝি একদিকের জল প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে—ভেঙ্গে গেছে বাঁধ। সেই ভাঙা বাঁধের ফাটল দিয়ে সর্বগ্রাসী লোনা জল এসে ঢুকেছে। সে জল প্লাবন জাগাবে। ধরণীধরের ইঙ্গিতে সে জল ডুবিয়ে দেবে সকল স্বপ্নের সবুজ ক্ষেত। ঠিক সেই দিনই বাড়ি থেকে ফিরল ছোটেলাল। এসে অবাক হয়ে গেল। গলির মোড় থেকে প্রেস-চলার ছন্দময় ধ্বনি তাকে আহ্বান জানাল না। কম্পোজিটর আর মেশিনম্যানদের কালিলাগা কাপড় আর গ্রীজ্‌ধরা জামার একটা নিশ্চিত ছবি দেখা গেল না। অবাক

হয়ে গেল ছোটেলাল! আরও এগিয়ে গেল ভেতরের দিকে। কম্পোজরুমে কে যেন বসে কাজ করছে! অচেনা এক যুবক! ছোটেলাল পরম উৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ওর পিছনে। আরও অবাক হতে হল। এ আবার কেমন ধারা কম্পোজিটার। সমস্ত ড্রয়ারগুলো টেনে খালি টাইপগুলো হাতড়াচ্ছে আর নেড়ে-চেড়ে দেখছে! রকম-সকম দেখে ছোটেলাল হেসে ফেলল।—কে? জয়ন্ত হাসির দিকে তাকাল।

—এ ভেইয়া! এটা হচ্ছে কি? এক মুখ হেসে প্রশ্ন করে ছোটেলাল।

—কম্পোজ করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? কি চাই তোমার? নিরিবিলি আবহাওয়াটা ভেঙে যাওয়ায় চোখদুটো বিরক্তিতে সিঁটকিয়ে ওঠে জয়ন্তর। উপহাসের হাসি হাসছে না ত লোকটা!—কিছু না ভেইয়া! শুনলাম নবজীবন প্রেসে কেউ নাই, খালি এক ভারি কম্পোজিটার কাজ করছে। তাই দেখতে এলাম। কেতো দিন কাজ শিখেছো ভেইয়া?

—শিখেছি অনেকদিন! তুমি তোমার কাজে যাও দেখি! বিরক্ত কোরো না কাজের সময়। জয়ন্ত আরও একটু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে। লোকটা সামনে থাকলে একবর্ণও কম্পোজ করতে পারবে না সে। রাগের মাথায় নড়েচড়ে ওঠে জয়ন্ত। ফস্ করে গ্যালিটা পড়ে যায় মাটিতে। ছড়িয়ে পড়ে টাইপগুলো। রাগে দুঃখে কেমন যেন হয়ে ওঠে জয়ন্ত। ছোটেলাল এবার সশব্দে হেসে ওঠে। হাসি আর তার থামতে চায় না। হাসির শব্দ আর কথা শুনে প্রণতি উঠে আসে কম্পোজ-রুমে। কথাগুলো তার চেনা, হাসিটাও তাই। তার মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শব্দ!—প্রণতি বলতে বলতে আসে—কি হল কি?—আরে ছোটেলাল যে, কখন এলে? হাসিটা চিনতে ভুল হয় নি তাহলে ওর। ছোটেলালকে দেখে প্রণতির মুখে ফোটে এক অনুচ্চারিত হাসি!

—এই ত এলাম দিদিমণি। হাতদুটো জড়ো করে মাথা ঝুঁকিয়ে একটা প্রণাম করে ছোটেলাল। বলে, ছুট্টি থেকে ফিরে ভাবলাম প্রেসে না জানে কতো কাম হচ্ছে! এসে দেখি কোই ভি নেই—সব ভোঁ ভোঁ। খালি এই কম্পোজিটর বাবু! তাও আবার কম্পোজিটর বাবুর যে-রকম কাজের ঘটাটা সে দেখেছে সেটা কল্পনা করেই হেসে ওঠে ছোটেলাল। প্রণতির মুখ গম্ভীর হয়ে আসে। কদিন থেকে যে কাণ্ড ঘটেছে প্রেসে, ছোটেলাল যখন শুনবে তখন সে কি হাসতে পারবে এমন করে? কিন্তু তবু কেন হাসে ও! প্রণতি একটু যেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার কি? হাসছ কেন ছোটেলাল?

ছোটেলাল কিছু বলার আগেই জয়ন্ত জবাব দেয়।—হাসছে আমার জন্যে!

অবাক হয় প্রণতি। জয়ন্তবাবুর মধ্যে হাসির কি পেল ছোটেলাল! জিজ্ঞাসু চোখ দুটো মেলে ধরে প্রণতি জয়ন্তর দিকে আরও গভীর করে!

—শুনুন প্রণতি দেবী!—টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে বলে জয়ন্ত—আমি আপনাদের মিথ্যে কথা বলেছি! কম্পোজিটারী আমি জানি না!

—জানেন না? এক মুহূর্তে পায়ের তলার মাটি যেন কেঁপে ওঠে প্রণতির!

—না, বিন্দু-বিসর্গও নয়। প্রণতির বিস্ময়াহত চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—তাহলে কি জন্যে আপনি মিথ্যে কথা বলে কাজ নিয়েছেন? কেন এভাবে ঠকিয়েছেন বাবাকে? তিনি ত আপনার কোনও ক্ষতি করেন নি!

জয়ন্ত ঠকিয়েছে প্রণতির বাবাকে? হঠাৎ যেন পিছনের আচরণটা নিজের কাছে একটা কালো ছবির মত ভেসে ওঠে জয়ন্তর সামনে! সমস্ত আস্থা, সমস্ত বিশ্বাস যেন হারিয়ে যাচ্ছে নিজের পায়ের তলার মাটির ওপর থেকে। জয়ন্ত বলে মাটির দিকে চেয়ে

—এক হিসেবে আপনাদের সত্যি আমি ঠকিয়েছি। কিন্তু উদ্দেশ্য আমার খারাপ ছিল না। জয়ন্ত এবার তাকায় প্রণতির দিকে। তাকিয়ে আবার বলে, বিশ্বাস করুন!

প্রণতি একটু নরম করে গলার স্বরটা। বোধ হয় হাসি দিয়ে ভেতরের ক্ষোভটা একটু ঢেকেও নেয়' বলে, ভালো উদ্দেশ্যে ঠকানো যে কি বস্তু সত্যিই বুঝতে পারলাম না জয়ন্তবাবু! প্রণতির হাসি কঠিন করে দেয় জয়ন্তর স্বর। একটু ধৈর্য ধরে যদি শোনেন তাহলে হয়ত বুঝতে পারবেন। নেহাৎ খেয়াল আর কৌতূহলের বশে আপনাদের এখানে প্রথমে আমি ঢুকেছিলাম। তারপর আপনার বাবার কথা শুনে, কি আশা, কি স্বপ্ন নিয়ে এ প্রেস তিনি গড়ে তুলতে চান জানতে পেরে, সত্যিই আমি মুগ্ধ হই। এ রকম একটা আদর্শের জন্য কাজ করার যথার্থই আমার লোভ হয়। একটি অন্যায় শুধু তখন করেছিলাম। আপনি গোড়াতে আমাকে কম্পোজিটারীর উমেদার ভেবে যে ভুল করেছিলেন, সে ভুলটা তখন শোধরাবার চেষ্টা করি নি।

নীরবে অসীম ধৈর্যের সঙ্গেই শুনে যায় প্রণতি। জয়ন্ত থামবার পরও ঘরটা থম থম করতে থাকে খানিকক্ষণ এবার প্রণতির মৃদু স্বর শোনা যায়—এ ভুল এখন শুধরেও ত কোন লাভ হচ্ছে না, কাজ করার লোভ আপনার যতই হোক শুধু তা দিয়ে ত চলে না। কাজ ত জানা চাই জয়ন্তবাবু!

জয়ন্ত যেন নিজেই এবার কঠিন হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ একটা প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ওর কণ্ঠে—জয়ন্ত বলে, কম্পোজিটারী না জানলে প্রেসের কোন কাজই কি করা যায় না? আর কম্পোজিটারীও কি এমন একটা কাজ, যা শেখা অসম্ভব? আপনার বাবা যা গড়ে তুলতে চান তাতে সত্যিকার আগ্রহ আন্তরিকতার কোন দাম নেই বলে যদি মনে করেন....তাহলে নমস্কার। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি! জয়ন্ত যাবার জন্যে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। হাত দুটো তার

ইতিমধ্যেই জড়ো হয়ে কপালে এসে ঠেকেছে। প্রণতি কিছু না বলে যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। এগিয়ে আসে ছোটেলাল। মেশিন ঘাঁটা মোটা হাত বাড়িয়ে ছোটেলাল যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।—আরে কাঁহা যাতে হো ভেইয়া! হাত মিলাও! ছোটেলাল জয়ন্তর ডান হাতটা ততক্ষণে চেপে ধরেছে তার দুহাতের মুঠোর ভেতর। ছোটেলাল প্রণতিকে বলে, শুনো দিদিমণি! ভালো কম্পোজিটর বহুৎ মিলবে, লেকিন সাচ্চা আদমি থোড়া আছে। হামি ছোটেলাল আদমি চিনে। জয়ন্ত ভেইয়া আজসে-হামার দোস্ত্ আছে। হামি এনাকে কাম শিখিয়ে দেবো! স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় প্রণতি ছোটেলালের দিকে। ওর নীরবতা মুখর করেছে ছোটেলালকে। প্রণতি যেন আরও নীরব হয়ে আসে! পিছন থেকে আর একটি স্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সে স্বর নিবারণবাবুর! চমকে দেখে সকলে নিবারণবাবুর দিকে। পিছন থেকে তিনি তাহলে সবই শুনেছেন। নিবারণবাবু বলছিলেন—তা ত দেবে বুঝলাম ছোটেলাল, কিন্তু তোমাদের মত দুজন সাচ্চা আদমি নিয়ে ত প্রেস চলবে না মাইনে ছাড়া কাজ করবে না বলে সবাই যে ছেড়ে গেছে তা বোধ হয় জানো না!

নিবারণবাবুকে দেখে মুখে হাসি ফুটতে ফুটতে মিলিয়ে গেল ছোটেলালের। অবাক হয়ে বলে—সবাই ছেড়ে গেছে! এ ত তাদের নিজেদের প্রেস আছে।

—নিজেদের প্রেস তারা চায় না ছোটেলাল! তারা চায় মাইনে নিয়ে চাকরি করতে!

—মাইনে নিয়ে চাকরি করতে!

—হ্যাঁ ছোটেলাল। পৃথিবীতে এ-ও ঘটে। আজ যা ছিল—কাল যে তাই থাকবে এমন কোন কথাই নেই।

ছোটেলাল নিজের মধ্যে ডুব দেয় এক মিনিট। চুপ করে থাকেন নিবারণবাবু। চুপ করে থাকে প্রণতি। জয়ন্তও। ছোটেলালের

মুখরতা মিলিয়ে ত যাবেই। কিন্তু, কথা বলে ছোটেলাল। কী এক গভীর থেকে যেন ডুব দিয়ে ওঠে। বলে, আচ্ছা আপনি কুচ্ছু ভাববেন না। সব শালাকে কাল দশ বাজে আমি এখানে হাজির করাবো ?

—দশটায় হাজির করবে! কেমন করে ছোটেলাল!—বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রণতি!

—সে দেখে লিবেন। ঠিক দশ বাজে! কথাটা শেষ করেই হন হন করে বেরিয়ে যায় ছোটেলাল ঘর থেকে, প্রেস থেকে,···গলি থেকে! ওদের বিস্ময় ওদের যেন আত্মীয় করে তোলে। নিবারণ-বাবুর আর প্রণতির সঙ্গে জয়ন্তও আশা-আনন্দের চোখে তাকিয়ে থাকে ছোটেলালের নির্গমনের দিকে।

সারাদিন আর বিশ্রাম পেল না ছোটেলাল। সারা কলকাতা টহল দিয়ে বেড়াল। খিদিরপুরে থাকে ষষ্ঠী। সেখানে গিয়ে হাজির হল সে। ষষ্ঠী ছোটেলালকে পেয়ে বেশ খানিকটা স্ফূর্তিবাজ হয়ে উঠল!

—আরে, ছোটেলাল যে, কবে ফিরলে ?

—আজকে।

—তারপর জমাদার সাহেব, প্রেসের দিকে গিয়েছিলে নাকি ?

—হাঁ ঐখান থেকেই আসছি। বহুৎ গড়বড় হয়ে গিয়েছে।

—তা যা বলেছ। মাইনে দেবে না কিছু না, কাঁহাতক সব কাজ করা যায়। মুখের কথায় ত পেট ভরে না।

—হাঁ-হাঁ। ও বাৎ ত ঠিক আছে।

—তুমিও কাজ ছেড়ে দাও। আমরা যখন সকলেই ছেড়েছি। তোমার আর ভাবনা কি ? কাজের লোক তুমি, যেখানে যাবে কাজ পেয়ে যাবে।

ছোটেলাল একটুখানি গর্বের হাসি হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

—কি হে ? অমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ কেন ?

—একঠো বাৎ ছিল ভাই তোমার সঙ্গে।

—কি কথা ! বলই না।

—কাল একবার যাবে প্রেসের দিকে ?

—সে কি হে ? প্রেস ত আমরা ছেড়ে দিয়েছি। মাইনে না পেলে আমরা কাজ করবো না।

—লেকিন মাইনে যদি দেয় ?

—মাইনে দিচ্ছেন নাকি নিবারণদা !

—হাঁ, হামাব সঙ্গে ত বাৎ চিৎ হয়ে গেল।

—তাই নাকি ? বাবুর সঙ্গে কথা হল তোমার ?

—জরুর। লেকিন ভারি চুপি চুপি কথা হল।

—ষষ্ঠীও গলার স্বর নামিয়ে বলে—আমার কথা কিছু হল নাকি ?

—তুমার কথাই ত হল ! বাবু বললেন কি কাল দশ বাজে হাজির হয়ে যাও ত মাইনের ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে।

—কাল দশটাব সময় ?

ষষ্ঠীর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে। খানিকটা স্বস্তিও ফুটে ওঠে বোধ হয়।

ছোটেলাল আরও স্বব নামিয়ে আনে।—হাঁ ঠিক দশ বাজে। লেকিন খুব হুঁশিয়ার ভাই। কাউকে কুচ্ছু বোলবে না। চুপি চুপি একলা গিয়ে লিয়ে আসবে। জানাজানি হইলেই মুস্কিল হয়ে যাবে ! ষষ্ঠী কথা দেয় ছোটেলালকে। খিদিরপুর থেকে বেহালা। মনোহরের বাড়িতে গিয়ে হাঁক দেয় ছোটেলাল।—এ মন্‌হর ! দেহাতী জমাদার ছোটেলাল মনোহর বলতে পারে না। বলে মন্‌হর। মনোহর বেরিয়ে আসে। আরে ছোটেলাল যে ! খুশি হতে পারে না মনোহর। এই ছোটেলাল এক অদ্ভুত মানুষ। মেশিনের সঙ্গে কারবার কিন্তু মনটা নরম মাটির মত। ওর সঙ্গে মিশতে গেলেই দেখবে তোমার মনের একটা ছাপ ধরে গেছে ওর মাটিতে। মনোহর তাই চমকে

ওঠে। এতবড় চালটা কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে? একবার মাথা গলিয়েছে যখন ধরণীধরের কাছে তখন আর বেরুবার পথ নেই। কাজ তাকে হাঁসিল করতেই হবে! কিন্তু ছোটেলাল?

—আরে কি এতো ভাবছ মন্‌হর? অ্যাঁ? ছোটেলাল ওর ঘরের মধ্যে ঢুকে চলে হন্ হন্ করে।

—আর ভাই ভাববো না? রোজগারপাতি নেই! বসে বসে ত কাজ করলেই চলবে না। বাবু আমাদের খাটিয়ে নেবে অথচ শালা মাইনের বেলা কাঁচকলা। আমাদের তাতে চলে কি করে—

—ও ত ঠিক বাৎ। লেকিন তলব মাঙ্গায়ে লেও!

—হুঁ। মনোহর উৎসাহিত হয়ে ওঠে—তুমি ত বললে মাঙ্গায়ে লেও। এখন চাইতে গেলে বাবু শুধু বড় বড় কথা বলে। জানোই ত সব! শুধু কি আর কথা দিয়ে পেট ভরে!

—প্রেস নাকি বন্ধ হয়ে গেলো?

—গেল বইকি! মুফৎ আর কে খাটতে চায় বল! নাও ছোটেলাল বিড়ি খাও একটা! তোমার আর কি? তুমি বাবুর পিয়ারের লোক!

—আরে ও বাৎ ত ছেড়ে দেও। পিয়ারের লোক টোক হামি না আছি।—বিড়ি ধরিয়ে নেয় ছোটেলাল মনোহরের কাছ থেকে। আরে ভাই একটা বাৎ ত শুনো।

—কি বাৎ?

—কাল দশ বাজে প্রেসমে হাজির হো যাও।

—অ্যাঁ?

—হাঁ।

—না ভাই জমাদার সাহেব। আমরা ধর্মঘট করেছি, তা আর হয় না।

—হাঁ-হাঁ। লেকিন চুপি-চুপি যেতে হবে।

—চুপি-চুপি!

—হাঁ। বাবুর সাথে ত হামার বাৎ হোয়েই গেলো। বাবু বললে কি মনহর কো বোলাও একদফে। তলব বি উসকা মিল্ যায়গা ঔর একঠো ফায়সালা ভি হো যায়গা।

মনোহর ঘন ঘন বিড়িতে টান দেয়। ছোটেলাল কথাটা মন্দ বলে নি। ধরণীধরের কাছ থেকে মোটা কিছু যখন পাওয়া গেছে তখন আর নিবারণবাবুর কাছ থেকেই বা বাদ যাবে কেন! নিবারণবাবুর পিয়ারের লোক ছোটেলাল। কাজেই কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মনোহর বলে—ঠিক কাল দশ বাজে?

—হাঁ, ঠিক দশ বাজে! লেকিন ভাই মনহর, কিসিকো মৎ বোল্না

—পাগল! সে লোকই নয় এ শালা। গৌরবে নিজেকে গাল দেয় মনোহর। বেহালা থেকে সটান মাণিকতলা। মাণিকতলায় থাকে সাতকড়ি। সেখান থেকে বউবাজার। বউবাজারে থাকে বলাই চাপাতলায় জীবন। বড়বাজারে প্রসাদ। ঝামাপুকুরে হরেকেষ্ট এমনি করেই ঘুরে ঘুরে চলে ছোটেলাল। মেশিনের কারবারী দেহাতী ছোটেলালের নরম মাটিতে ছাপ পড়ে, যেখানে যায় সেখানেই। ছোটেলালের মুখে শুধু এককথা—কাল ঠিক দশ বাজে ভাই। লেকিন কিসিকো মৎ বোল্ না।

পরের দিন আর এক বিস্ময়ের সকাল। এ বিস্ময় ঝড়ের মত প্রচণ্ড নয়, ঝড়পোহানো ভোরের মত শান্ত। বেলা দশটা বাজে একা ঘরে বসে আছেন নিবারণবাবু, কেউ কাজে আসে নি। প্রেস বন্ধ। তা হলে সত্যিই ওরা কাজ ছেড়ে দিয়েছে!

—নিবারণদা! ছোট একটি ডাক। গলাটাও খুব ভরসাপূর্ণ নয়।

—নিবারণদা?

—কে? নিবারণবাবু বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে হরেকেষ্ট।—কি ব্যাপার?

—আমি চুপি চুপি চলে এসেছি কেউ জানতে পারে নি।

—কেউ জানতে পারে নি? মনে মনে অবাক না হয়ে পারেন না নিবারণবাবু! হঠাৎ হরেকেষ্ট মত বদলালো কেন? আর দরজার পেছনেও কে একজন দাঁড়িয়ে না? প্রসাদ?

নিবারণবাবু বলেন—তা চুপি চুপি চলে আসার মানে?

—মানে আবার বলতে হবে? ও শালারা জানতে পারলে একেবারে কাক চিলের মত ছেঁকে ধরবে না তোমায়! তুমি বরং এই বেলা আমারটা চুকিয়ে দাও। আমি সরে পড়ি!

—শুধু তোমারটাই চুকিয়ে দেব! আরও অবাক হন নিবারণবাবু। দরজার পিছনের ছায়া নড়ে ওঠে এইবার। এগিয়ে আসে প্রসাদ।—আজ্ঞে সেই সঙ্গে আমারটাও—হরেকেষ্ট প্রসাদকে দেখে যেন আঁতকে ওঠে। পরক্ষণেই ওঠে খিঁচিয়ে—ও, গন্ধে গন্ধে ঠিক এসে হাজির হয়েছে শালা শকুন তা দাও দাদা আমাদের দুজনেরটাই দাও চুকিয়ে। আমরা টুঁ শব্দটি করবো না।

—আর আমি বানের জলে ভেসে যাই কেমন?

কে? কে আবার? চমকে দেখে সকলে। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে জীবন। প্রসাদ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।—তা দাও নিবারণদা আমাদের তিনজনেরটাই চুকিয়ে দাও, আর কেউ জানতে পারবে না।—

কিন্তু জানাজানির আর বাকী নেই তখন। দেখা যাচ্ছে জীবনের পিছনে হাজির হয়েছে আরও অনেকে। সকলে দাঁড়িয়ে আছে একক হয়ে আর সকলকে এড়াবার চেষ্টায়। কিন্তু সবাইকে জড়িয়ে সে এক ভীড়। সকলের চুপি চুপি কথায় সে এক গুঞ্জন। নিবারণবাবু বললেন, আরও অনেকেই জানতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে।

—তাইত। এরকম কথা ছিল না ত। ব্যাপারটা তাহলে দেখতে হয়।

নিবারণবাবুর বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। শুধু জীবন-হরেকেষ্ট-

প্রসাদ নয়। এসে হাজির হয়েছে সাতকড়ি, ষষ্ঠী, মনোহর···। ওরা সকলে ঘিরে ধরে নিবারণবাবুকে—নিবারণদা, দাও বাবু আমাদের মাইনেটা চুকিয়ে দাও। আজ আর ছাড়ছিনে। জানাজানি যখন হয়েই গেছে ব্যাপারটা, তখন আর ঢাক ঢাক করে লাভ কি ?

ওদের সমস্বর একটু থামতে নিবারণবাবু কথা বলেন। ওঁর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি।—কি ব্যাপার বল ত! তোমাদের সকলকে এমন দল বেঁধে ফিরে আসতে দেখে আমি খুশি হয়েছি সত্যি, কিন্তু কারণটা এখনো বুঝতে পারছি না। তোমরা কি তাহলে মত বদলেছ ?

মনোহর বলে, বাঃ মত ত তুমি বদলেছ আর ডেকে পাঠিয়েছ সেইজন্যে !

—আমি ডেকে পাঠিয়েছি ! অবাক হয়ে বলেন নিবারণবাবু, যেন বলতে চান, এ আবার কোন্ চক্রান্ত ?

ষষ্ঠী বলে, হ্যাঁ, আমাদের ক'জনকে চুপি চুপি মাইনে দেবার জন্যে ডেকে পাঠাও নি তুমি ! এ শালারা কি করে খবর পেলে তা বুঝতে পারছি না।

পরস্পরেরই অবাক হবার পালা চলে।

কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। মাইনে দিতে হলে চুপি চুপি কেন ডাকবো ষষ্ঠী। মাইনে ত আর ঘুষ নয়, যে লুকিয়ে দিতে হবে !

সাতকড়ি বলে, তবে····তবে যে ছোটেলাল গিয়ে বলে এল···বলে এল কাউকে না বলতে····?—অ্যাঁ !—কোথায় ছোটেলাল ?

সমস্বরে খোঁজ উঠলো—কোথায় ছোটেলাল ? কোথায় সেই শালা ?

—এই যে শালা ছোটেলাল এই যে হামি খাড়া আছি।—একটি বজ্রপাতে সকল ঝঞ্ঝাকে স্তব্ধ করার স্বর শোনা গেল। সকলে দেখল মেশিনের কারবারী ছোটেলাল মস্ত এক লাঠি নিয়ে দরজা আগলে

দাঁড়িয়ে।—এই যে হামি খাড়া আছি। শালা বেইমান সব পাজী! ইয়ে প্রেস বানানে কে লিয়ে এক রোজ সামনে হাত মিলায়া থা কি নেই, ঔর আজ পিছে ছোরি মারনে মাঙ্‌তা! চুপি চুপি সব মাইনে নিতে এসেছে—মাইনে না হোলে কাম করবে না! দেখি কোন্ শালা কাম না করে! এই হামি খাড়া আছি!—লাঠিটা দুম করে শব্দ করে ছোটেলাল একবার। আজ আর নরম মাটি নয়! মেশিনের মত পাথর ছোটেলাল! মনোহর আর স্থির থাকতে পারে না। ফেটে পড়তে চায় যেন—মানে! কাজ করি না করি আমাদের খুশি! তোমার জুলুম আমাদের মানতে হবে না কি?

কিন্তু মনোহরের গলাবাজিতে ফল ফলে উলটো। এক কোণে একটা মুগুরের মত কি পড়েছিল, সেটাকে খপ্ করে তুলে মাথার ওপর উদ্যত করে চেঁচিয়ে ওঠে বলাই—ভালো কথায় ঘাড় সিধে না না হলে জুলুমই মানতে হবে। তুমি ঠিক করেছ ছোটেলাল! শালাদের ভাল কথায় অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোঁৎকা না দিলে ওদের মগজে কিছুই পৌঁছয় না। এই আমি রইলাম তোমার পাশে। দেখি কোন্ শালা এবার ঘাড় বাঁকায়। ছোটেলাল অল্প কথায় কাজ সারতে চেয়েছিল কিন্তু বলাই একেবারে শোরগোল তুলে বসে।

—ভালো হবে না কিন্তু বলাই; ভালো হবে না ছোটেলাল—চোখ দুটো যথাসম্ভব বড় করে আর গলার শিরাগুলো যথাসম্ভব ফুলিয়ে চীৎকার করতে থাকে মনোহর—এখনো আমাদের রাস্তা ছেড়ে দাও নইলে....নইলে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে কিন্তু—সত্যিই যেন খুন হয়েছে এমন ভয়ার্ত মুখে কথাটা শেষ করে হাঁপাতে থাকে মনোহর। ছোটেলাল যেন পাথর হয়ে গেছে। কেবল সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে হাতের লাঠিটার মত। টলবে না। বলবে না। বলাই কিন্তু রুখে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে—হোক খুনোখুনি। একটা গণ্ডগোল বাধল বুঝি! সকলের মুখ থমথম করছে—জয়ন্তও এসে পড়েছে ওদের মধ্যে। নিবারণবাবু হঠাৎ এগিয়ে আসেন ছোটেলাল-

বলাইয়ের দিকে। গলাটা তাঁর যেন ভেঙে গেছে এমন দুর্বল স্বর শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে—এদের রাস্তা ছেড়ে দাও ছোটেলাল—সরে দাঁড়াও বলাই—

আস্তে আস্তে সরে যায় ছোটেলাল। জায়গা দেয় বলাই। মুহূর্তে যেন সব প্রাণ শুকিয়ে গেছে ওদের দেহ থেকে।···নিবারণবাবু তখনও বলছিলেন,—তোমাদের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত লজ্জিত। জুলুম সব সময়ই জুলুম। উদ্দেশ্য ভালো হলেই তার দোষ কেটে যায় না, বড় কাজ করবার জন্যেও মানুষের স্বাধীনতায় হাত দেবার অধিকার কারো নেই। এবার ফিরে দাঁড়ান নিবারণবাবু বাকী সকলের দিকে—যাও ভাই তোমরা। মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে তোমাদের এখানে আনবার জন্যে ছোটেলালের হয়ে আমি মাপ চাইছি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে যেন সকলে। একদল মেঘ জল ঝরাতে এসে যেন এলোমেলো হাওয়ায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। যাবার আগে একটু দাঁড়াবে ভাই, দুটো কথা আমার শুনে যাবে? বলছে জয়ন্ত। ওদের কাছে সব চেয়ে অপরিচিত এই মানুষের কথায় ওরা যেন কান পাতে। অবাক হয়। জয়ন্ত বলে চলেছে—এ প্রেসের আমি কেউ নই। সত্যি কথা বলতে গেলে প্রেসের কাজে সবে আমার হাতে-খড়ি হয়েছে। কিন্তু একটি মানুষের আশা আর স্বপ্নের কথা শুনে এই ভাঙাবাড়ির এই সামান্য ছাপাখানাটিকে প্রাণ দিয়ে আমি ভালবেসে ফেলেছি। সে মানুষটি তোমাদের নিবারণদা ···তাঁর সঙ্গে তোমরাও একদিন এই স্বপ্ন আর আশার ভাগ নিয়েছিলে। আজ তবু তোমরা তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ; যাবার আগে একটি কথা শুধু তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই···তোমাদের মধ্যে এমন একজনও কি নেই, এ প্রেসের ওপর সত্যিকার টান যার এখনো আছে—এ প্রেসকে এখনো যে আপনার মনে করে!

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সকলে। অদ্ভুত এই লোক, একান্ত

অপরিচিত, কিন্তু কি পরিচিত এর কথা। এলোমেলো হাওয়ার মধ্যে এতটুকু এক শীতল স্পর্শ, যে স্পর্শ উষ্ণ মেঘে জল ঝরাবে। জয়ন্ত বলে চলেছে তখনও—মাইনে নিয়ে মনিবের হুকুম তামিল করবার চাকরি ত তোমরা চিরকাল করে এসেছ! তোমাদের দুঃখ কি তাতে ঘুচেছে? নিজের হাতে কালি লাগিয়ে চিরকাল তোমরা পরের কথাই ছেপে এসেছ। একবার নিজেদের কথা নিজেরা ছাপবার জন্যে, নিজেদের জিনিস নিজেরা গড়ে তোলবার জন্যে সব দুঃখ হেলায় তুচ্ছ করে দাঁড়াবার সাহস কি তোমাদের একজনেরও নেই?

একে একে সকলের দিকে তাকায় জয়ন্ত। সকলের চোখে চোখে যেন একটা অব্যক্ত আবেগ। হঠাৎ কয়েকজন বলে ওঠে—আমাদের আছে। নবজীবন প্রেস আমরা ছাড়বো না। আর একদল বলে—আমরাও না। তারপর সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—আমরাও না।

প্রথমে অল্প তারপর অবিশ্রান্ত জল ঝরে পড়ে প্রতিক্ষমান মেঘ থেকে।

খানিকক্ষণ কোলাহল চলতে থাকে ওদের মধ্যে। আর সেই কোলাহলের মধ্য দিয়ে সরে যায় একটি মূর্তি। সে মনোহর। মনোহর চলে যায় অন্য পথে আরও সূক্ষ্ম কিন্তু সূচ্যগ্র ছিদ্রপথে প্রবেশের পথ সন্ধানের উদ্দেশ্যে।

সাত

যে নতুন করে সুর বাঁধল ওদের মনে তাকে নিয়ে কাজ হয় শুরু। জয়ন্ত হয়ে ওঠে ওদেরই একজন। জয়ন্ত কাজ জানে না। কিন্তু সেইটেই যেন আজ তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। সকলের কী অসীম আগ্রহ ওকে কাজ শেখাবার। সব কাজই যেন জানতে হবে ওকে,

কাজ করতে হবে সকলের হয়ে। আপাততঃ প্রুফ দেখছে জয়ন্ত ষোল এম্ ডবল কলম সেই অজ্ঞাত মন্ত্রে ঝরঝরে ছাপা' হয়ে এসে পড়েছে তার হাতে। কুঞ্জ মজুমদারের লেখা 'সাবধান'। প্রুফ দেখে ছাপতে চালান দিয়ে দিয়েছে ও। ছাপা হচ্ছে ট্রেডল্ মেসিনটায়। ষষ্ঠী বলে, কি রকম দেখছেন জয়ন্তবাবু? আমাদের এডিটর সাহেবের ধার কিন্তু খুব!

মনে মনে না হেসে পারে না জয়ন্ত। যে জয়ন্ত লেখক সাদা কাগজে কালো আঁচড়ের আগুন জ্বালাবার মন্ত্র যার জানা আছে সেই জয়ন্ত হাসে মনে মনে। পরিচয় সে নাই বা দিল।

সাতকড়ি জবাব দেয় ষষ্ঠীকে—হ্যাঁ ধার আছে, তবে দু'দিকেই। কখন যে কোন্‌দিকে কাটেন বোঝবার যো নেই। ডাইনে না বাঁয়ে, কংগ্রেস না যোগজীবন সমাদ্দার, আমরা কোন্ পক্ষে বুঝলেন কিছু এ লেখা পড়ে?

—না তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শ্যাম আর কূল দুইই রাখব 'নতুন খবর' এর নীতি কি এই? আমাদের নিজস্ব কিছু বলার কি নেই? জয়ন্তর মনের হাসি জিজ্ঞাসু বাঁকা ভুরুতে যেন ধারালো হয়ে ওঠে। কিন্তু জবাব দেবার আগে কুঞ্জকে আসতে দেখে ওরা চুপ হয়ে যায়। কুঞ্জর চোখে-মুখে বিরক্তি আর মেজাজ!—ওহে এখানে এত জটলা কিসের? এটা কি ছাপাখানা না তামাশার জায়গা! যাও, যে যার কাজে যাও! সকলের দিকে কথাটা বললেও দৃষ্টিটা ওর তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে জয়ন্তর ওপর। যে-কোন কারণেই হোক প্রথম থেকেই কুঞ্জর দৃষ্টিটা বাঁকা হয়ে পড়েছে জয়ন্তর ওপর। সাতকড়ি আর ষষ্ঠী কাজে লেগে যায়!—জয়ন্ত বেরিয়ে চলে আসে কম্পোজ-রুমের দিকে। জয়ন্তর মনের খুশি যেন আবার উপছে পড়ছে। হালকা করে শিস্ দিতে দিতে এগোয় জয়ন্ত কম্পোজিটর অমূল্যর দিকে।—কই, দিন অমূল্যবাবু, দিন আর কি কাজ আছে! ওখানে সব হাত খালি করে বসে আছে।—কথা শেষ করে আবার

শিস্ দিতে থাকে জয়ন্ত। অমূল্যবাবু কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেন প্রুফ। কুঞ্জ এসে ঢোকে ঘরে। এবার আর বিরক্তি নয়, রাগ ফেটে উঠেছে ওর চোখে-মুখে।—কে হে! শিস্ দিচ্ছে কে? তুমি বুঝি?

জয়ন্ত মাথাটা নীচু করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু কেন শিস্ দিচ্ছিলে শুনি? এটা কি তাড়িখানা না নাচের মজলিস! তুমি নতুন এসেছ না—?

অমূল্য কি যেন বলতে যাচ্ছিল—আজ্ঞে উনি আমাদের—

—থামো। কুঞ্জ চুপ করিয়ে দেয় অমূল্যকে। তারপর জয়ন্তর দিকে ফিরে বলে, আমায় কাজ করতে হয়···মাথার কাজ, যার জোরে এ কাগজ চলে, তোমাদের অন্ন জোটে, বুঝেছ এ রকম বেয়াদপি আর কখনও যেন না হয়।

একেবারে গোড়ায় আঘাত করে জয়ন্তকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে কুঞ্জ।

জয়ন্ত অপরাধীর মত স্বীকার করে—না, আর হবে না।

—মনে থাকে যেন। আর একবার শাসিয়ে ওঠে কুঞ্জ। এবং পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ায় যাবার জন্যে। কিন্তু যাওয়া হয় না কুঞ্জর। ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে নিবারণবাবু। নিবারণবাবুকে দেখে কুঞ্জ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এই যে নিবারণবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম—

—আমাকে খুঁজছিলেন? আচ্ছা আসছি একটু পরে।

—একটু পরে কেন? আসুন না এখুনি। প্রণতি কোথায় গেল?

—সে তার ঘরেই আছে।

—তাহলে চলুন, সেখানেই শুনবেন চলুন। এবারের ইলেকশন নিয়ে যা লিখেছি একখানা একেবারে আগুন! আগুন!—আগুনের শিখার মতই হাতের আঙুল নেড়ে বলতে থাকে কুঞ্জ—নেহাৎ আপনার এই সস্তা সাপ্তাহিক, তাই লেখটা একরকম মাঠেই মারা যাবে। নইলে হত একটা বড় দৈনিক····দেখতেন স্রেফ একটা অ্যাটম বোমা হয়ে ফেটে পড়তো। চলুন শুনিয়ে দিই। কুঞ্জ

একরকম ঠেলে নিয়ে যায় নিবারণবাবুকে।

বলাই বলে, কি রকম চীজখানি দেখছেন জয়ন্তবাবু। আমাদের এডিটর সাব! নিবারণবাবুর হবু জামাই।

—হবু জামাই! বিস্মত হয়ে পড়ে জয়ন্ত! ষষ্ঠী বলে, হ্যাঁ, ভাবগতিক দেখে তাই ত মনে হয়। এক সঙ্গে রাজ্য ও রাজকন্যা দুই-ই উনি তাক করে বসে আছেন। আপনি নতুন কি না, তাই প্রথমটায় একটু ভড়কে গেছেন। আমাদের ও-সব গা সওয়া হয়ে গেছে। বলাই রুখে ওঠে ষষ্ঠীকে—না, গা সওয়া হল কই? নেহাৎ খুব সামলে সামলে চলি। কোনদিন হঠাৎ হাত তুলে বসব এই ভয়। আমার আবার চড়া বায়ুর ধাত!

—না, ও রকম কথা বলবেন না। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ওঠে, তারপর একটু চিন্তিত মুখে বলে, ইনিই তাহলে আমাদের সম্পাদক, যাঁর মাথার জোরে আমাদের কাগজ চলে?

বলাই মুখ বেঁকিয়ে বলে, হ্যাঁ, কত বড় মাথা তার আবার জোর। কি আছে ও মাথায়, ক'টা কথার প্যাঁচ ছাড়া? এঁরা হল ভাষার ভাড়াটে গুণ্ডা। গুণ্ডারা টাকা খেয়ে ছোরা চালায়, আর এঁরা চালান কলম—এইটুকু তফাৎ।

জয়ন্ত অবাক হয়ে শোনে কম্পোজিটর বলাইয়ের কথার ধার।

ষষ্ঠী বলে, কেন যে নিবারণদা আর তাঁর মেয়ে কুঞ্জবাবু বলতে অজ্ঞান, বুঝি না। বলাই বলে, এবার আমরা সাফ্ বলে দেবো, হয় কুঞ্জবাবুকে ছাড়ুন নয় আমাদের।

জয়ন্ত বলে, একটু ধৈর্য ধরে দেখুন না। মানুষ যেমনই হোক না কেন, লেখা ত ভাল হতে পারে! দেখাই যাক না কি রকম এ্যাটম বোমা উনি ছাড়েন। কথা শেষ করে কাজে মন দেয় জয়ন্ত। কুঞ্জ মজুমদার তার এ্যাটম বোমের মতো লেখাটা শুনিয়ে মেজাজী হয়ে ফিরে আসছিল তার নিজের ঘরে। পথে কম্পোজ-রুমের দরজা। দরজার গোড়ায় বসে সাতকড়ি। কুঞ্জ একটু দাঁড়িয়ে ডাকল—ওহে।

এক মনে কাজ করছিল সাতকড়ি। শোনে নি বোধ হয় তাই সাড়া দেয় না।

ডাকটা আগেই কানে গেছে বলাইয়ের। বলাই ডেকে দেয় সাতকড়িকে—ওহে সাতকড়ি শুনতে পাচ্ছনা? এডিটর সাহেব ডাকছেন!

সাতকড়ি সচকিত হয়ে ওঠে—আমায় ডাকছেন?

—হ্যাঁ। ডাকলে উঠে আসতে পার না! হুকুমের ভঙ্গীতে বলে কুঞ্জ।

সাতকড়ি তাড়াতাড়ি টুল ছেড়ে উঠে আসতে আসতে বলে, আজ্ঞে কেন পারবো না। খুব পারি।

—যাও, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস চট্ করে।—এত ডাকাডাকির পর সামান্য এক প্যাকেট সিগারেটের অর্ডার!

—চট করে আনতে হবে? পশ্ন করে সাতকড়ি।

—হ্যাঁ, চট করে—এখুনি। উত্তরোত্তর ভঙ্গীটা তীক্ষ্ণ করতে চায় কুঞ্জ।

হুকুম দিয়ে আপনার ঘরের দিকে ফিরে যেতে যেতে কুঞ্জ একবার পিছন দিকে ফিরে তাকায়। আশ্চর্য! মাথা থেকে পা পর্যন্ত চন্ করে ওঠে কুঞ্জর রক্ত। সাতকড়ি আবার গিয়ে বসেছে ওর টুলে!

—কি গেলে না যে। হুঙ্কার দিতে গিয়ে কুঞ্জর গলা বোধ হয় কেঁপে উঠল একটু।

সাতকড়ি অনায়াসে বললে—হাতের কাজটা আগে সেরে নিই।

কুঞ্জর বিস্ময়ের আর অন্ত নেই —কাজ আগে সারবে মানে? আমি বলছি আগে যাও। অসম্ভব রকম চীৎকার করে ওঠে কুঞ্জ।

ষষ্ঠী কথা কয় এবার।—অত চেঁচাচ্ছেন কেন স্যার। আমরা ত কেউ কালা নই।

কুঞ্জর চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। একবার দূরে-বসা জয়ন্তর

দিকে তাকিয়ে নিয়ে কুঞ্জ বলে ওঠে—Shut up! তোমায় কেউ ফপরদালালি করতে ডাকে নি। কি সাতকড়ি তুমি যাবে কিনা?

—বললাম ত একটু পরে যাচ্ছি। আগের মতই ধীর কণ্ঠে বলে সাতকড়ি।

হঠাৎ বলাই তার টুল ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ায় কুঞ্জর সামনে। হাতে তার একটা বিড়ি। বিড়িটা দেখিয়ে বলাই বলে, ততক্ষণ না হয় এই বিড়ি একটা খান না! বেশ ভাল মিঠে-কড়া বিড়ি।

—How dare you!—দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কুঞ্জ বলে—বিড়ি দিতে এসেছ আমাকে! আমি তোমাদের ইয়ার?

চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণ বেরিয়ে এসেছেন নিবারণবাবু, এসেছে প্রণতি ও ছোটেলাল। নিবারণবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন—কি হয়েছে কি?

কুঞ্জ বলে, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন? যত সব ছোট-লোকদের আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছেন। জানেন না, এতবড় আস্পর্ধা ওদের আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে আসে।

নিবারণবাবু যেন হতভম্ব হয়ে পড়েন। কোন কথা বার হচ্ছে না তাঁর মুখ থেকে।

কথা বলে ছোটেলাল। বলাইকেও ডেকে বলে—কিহে বোলাই? তুমি এডিটর সাবের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গেছ?

—ইয়ার্কি নয় ভাই, দিতে গিয়েছিলাম বিড়ি তবে আমারই ভুল হয়েছে।

—হাঁ। জরুর ভুল হোইয়েছে। আমরা সব মেশিন চালাই, কম্পোজিটরী করি, আমরা কুলি-মজুর ক্লাস, ছোটলোক আছি আর উনি কলম দিয়ে লেখেন ভদ্দরলোক আছেন? উনি তোমার বিড়ি খাবেন!

—সেইটেই ত ভুল হয়েছে। তবে কি জানো ছোটেলাল, এই আমাদের ছোটলোকদের কথা কাগজে লিখতে, ওঁরা ভাবে গদ গদ

হয়ে ওঠেন। সভায় সমিতিতে, থিয়েটারে বায়স্কোপে আমাদের হয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতা দিয়ে হাততালি নেন্, অথচ আমাদের সঙ্গে সত্যিকারের একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই ওঁদেব জাত যায়, মান যায়। এইটে বুঝতে পারি না।

আশ্চর্য! কারও মুখে কোন কথা নেই। সকলে শুনছে বলাইয়ের কথা।

কথা বলে কুঞ্জ। কেমন একটা অসহায় অস্বস্তি ফুটে ওঠে ওর স্বরে—শুনছেন···শুনছেন এদের কথার ধরণ! এই সব আমায় সহ্য করতে হবে বলতে চান! এই সাতকড়িকে আমি এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলেছিলাম। And he refused!

—যাবো না ত বলি নি কুঞ্জবাবু! কুঞ্জর ইংরেজী অনুযোগের বাঙ্‌লায় জবাব দেয় সাতকড়ি। আগের মতই শান্ত স্বর।

—কিন্তু তাই বলাই উচিত সাতকড়িবাবু!

চমকে উঠে কুঞ্জ তাকায় কথাটার উৎসের দিকে! কথাটা বলছে প্রণতি, আর কেউ নয়। প্রণতি কুঞ্জকে বলে—এঁরা এখানে কম্পোজিটরী করেন কুঞ্জবাবু! আমাদের ফাইফরমাস খাটবার চাকর এঁরা ন'ন!

—ওঃ, তুমিও তাহলে ওদের দলে! আমার সিগারেট আনতে বলা অন্যায় হয়েছে! পরাজিতের কণ্ঠস্বর শোনা যায় কুঞ্জর কথায়!

জয়ন্ত এগিয়ে আসে এইবার। বলে, না অন্যায় হবে কেন? দিন আমিই আপনার সিগারেট এনে দিচ্ছি।

—তুমি! কুঞ্জ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে!

—হ্যাঁ আমিই যদি আনি, ক্ষতি কি? বেশ হাসতে হাসতেই বলে জয়ন্ত। কুঞ্জ বাধা দিতে পর্যন্ত ভুলে যায়। বাধা দেন নিবারণবাবু—না না জয়ন্ত তোমায় যেতে হবে না!

—গেলেই বা তাতে কি হয়েছে! এক প্যাকেট সিগারেট এনে

দিলে যদি কুঞ্জবাবুর মেজাজ ভাল থাকে ত একবার কেন একশোবার আমি এনে দিতে প্রস্তুত। কথা শেষ করেই হন হন করে বেরিয়ে যায় জয়ন্ত সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে।

॥ আট ॥

এদিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে দুর্লভ ঠাকুর। সকাল থেকে দুর্লভকে বাজারে পাঠিয়ে বসে আছে খুশি। এতটুকু মেয়ে খুশি আর যে-সে নেই। কলকাতায় এসে রীতিমত গিন্নী হয়ে পড়েছে সে দুদিনে। মনের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর। দুর্লভকে এখন সে রীতিমত হুকুম করে, রান্না শিখিয়ে দেয়। শিখিয়ে দেয় তরকারি কুটতে, মাছের আঁশ ছাড়াতে। তবে, দুর্লভের নির্বুদ্ধিতার আর অন্ত নেই। নেহাৎ খুশির সংসার তাই রক্ষে। তেমন মেজাজী গিন্নীর কাছে পড়লে দুর্লভের যে কী অবস্থা হত তা আর ভাবতে হয় না। কিন্তু আজ খুশি রেগেছে সত্যিই। বুদ্ধি না থাক, একটা আক্কেল থাকা ত দরকার লোকটার! সেই যে সকাল থেকে বাজারে গেছে এখনও কোন পাত্তা নেই! অথচ উনুনটা পুড়ছে ত পুড়ছেই। খুশি যেন কোমর-বেঁধে রইল দুর্লভকে দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দেবে বলে। খানিক পরেই উদয় হল দুর্লভ। হাতে তার বাজারের থলি। আনন্দের আতিশয্যে ঐ রোগা চেহারা নিয়েই যেন হাঁসফাঁস করতে করতে আসছে ও! ভাঁড়ার ঘরে একটা বঁটি নিয়ে বসে ছিল খুশি। দরজার সামনে দুর্লভকে আসতে দেখেই বঁটি সরিয়ে রেখে খুশি উঠে দাঁড়াল। পাকা গিন্নীর ভঙ্গীতে বললে, না, তোমায় নিয়ে আর চলবে না ঠাকুর। একবেলা ধরে উনুন বয়ে গেল, তবু তোমার বাজার করা আর হল না?

—তা কি করবো দিদিমণি। গম্ভীর হয়ে বললে দুর্লভ—বাজার করা চারটিখানি কথা নয়। এ-বাজার ও-বাজার সব বাজার ঘুরতে হবে ত।

—ওমা, এ-বাজার ও-বাজার ঘুরতে হবে কেন! দুর্লভের চালাকি যে সে ধরতে পেরেছে এমন ভঙ্গী ফুটে ওঠে খুশির স্বরে।—বাজার ত লোকে এক জায়গাতেই করে। দুর্লভ একেবারে বিগলিত হয়ে বলে—সে যারা করে তারা করে দিদিমণি, আমার কাছে ওই ফাঁকিটি পাবে না। যেমন মাইনে নেবো পুরো, তেমনি গতর খাটিয়ে একেবারে গুঁড়ো করে দেবো। শ্যামবাজার, রাধা-বাজার, টেরিটিবাজার, মল্লিকবাজার, সব বাজার না ঘুরে একটি পাই পয়সার জিনিস কেনবার পাত্তরই আমি নই।

তবু খুশির মেজাজ গলেনা। বলে, থাক, তোমায় আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। এখন থেকে অত বাজার না ঘুরে এক বাজার থেকে সব কিছু আনবে বুঝেছ? দুর্লভ যেন মুষড়ে পড়ে খুশির কথা শুনে। অনেক কষ্টে বলে, তা তুমি যদি বল ত তাই আনবো। কিন্তু ঠকে এলে কিছু বলতে পাবে না—হুঁ—

এবার খুশির মনটা একটু যেন নরম হয়। বলে, আচ্ছা, কি রাজ্যি জিতে নিয়ে এসেছ দেখি—খোল দেখি তোমার থলি—

দুর্লভ উৎসাহিত হয়ে ওঠে এইবার ওর কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে। একরকম লাফিয়ে উঠেই দুর্লভ বাজারের থলিটা উপুড় করে ঢেলে দেয় খুশির সামনে। বাজার দেখে খুশির চোখ দুটো বড় আর গোল হয়ে ওঠে। কিছু আধ-পচা মাছ আর সামান্য তরীতরকারি। এই বাজারে যে ওদের বাড়ির তিনটে লোকেরও চলবে না তা খুশির বুঝতে আর দেরী হয় না। খুশি যেন একেবারে আর্তনাদ করে ওঠে—ওমা, এতক্ষণে তুমি এই বাজার করে এনেছ ঠাকুর। সমস্ত ঘুরে এই তোমার সওদা করা! উল্টো বোঝে দুর্লভ। মনে করে খুশি বুঝি উৎসাহিত হয়ে উঠেছে! দুর্লভ বিগলিত হয়ে বলে, আমি ত

আগেই বলেছি দিদিমণি ফাঁকিটি আমার কাছে পাবে না। বাজার পছন্দ হয়েছে ত!

চীৎকার করে বলে খুশি—তোমার মাথা হয়েছে। যত রাজ্যের পচা গলা রোথো জিনিসগুলো কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছ! আর এই তোমার মাছ কেনা! তোমায় না বড় মাছ আনতে বলেছিলাম! দুর্লভের মুখ বিষণ্ণ হয়ে আসে। ভারি গলায় বলে, ওই দেখ দিদিমণি, তুমি খামোখা আমার ওপর গোঁসা করছ। বড় মাছ কি বাজারে আছে যে আনব!

—কলকাতার বাজারে বড় মাছ নেই, তুমি বলছ কি ঠাকুর! খুশি এবার আর রেগে নেই—বিস্মিত হয়ে গেছে।

—তবে আর কি বলছি। বড় গঙ্গায় পাহাড় প্রমাণ এক মনোয়ারী জাহাজ এসেছে না, সেই জাহাজের চাকায় যত বড় মাছ সব একেবারে কচুকাটা গো দিদিমণি, সব কচু কাটা হয়ে গেছে। চুনোপুঁটি দু'চারটে গলে টলে গিয়ে যা বেঁচেছে! খুশি এবার ধরে ফেলেছে ওর চালাকি। এই সব বাজে কথায় ভোলবার মেয়ে সে নয়। খুশি বলে, তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আর এই পচা আলুগুলো কি জন্যে কিনে এনেছ শুনি?

—ওমা পচা কেন হবে গো! দিব্যি টাটকা টস্‌টসে দেখে কিনে আনলুম।

—চোখে দেখতে পাচ্ছ না, পচা কি না।

—তা হবে দিদিমণি।—একটা আলু তুলে নিয়ে টিপতে-টিপতে আর শুঁকতে শুঁকতে দুর্লভ বলে,—তা হতে পারে দিদিমণি। আনতে আনতে রাস্তায় রোদ লেগে পচে গেছে। কমখানি রাস্তা ত নয়। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে খুশি এবার। বলে, তুমি একটি মিথ্যের জাস্থ! দুর্লভ কিছু না বলে এবার শুধু মাথা চুলকোয়! খুশি একটু থেমে বলে, এখন হিসেবটা দাও দেখি। আবার মুষড়ে পড়ে দুর্লভ—ওই ত ফ্যাসাদ করলে দিদিমণি, ও হিসেব টিসেব

আমার মাথায় ঢোকে না। তবে ফাঁকিটি আমার কাছে পাবে না। তুমি পাঁচ টাকা দিয়েছিলে, এই নাও তার দু'আনা ফেরৎ। খুশি যেন এবার পাগল হয়ে যাবে।—এই বাজার ক'রে পাঁচ টাকার শুধু দু'আনা ফেরৎ!

—তাও কি ফেরৎ হত দিদিমণি। নেহাৎ হিসেবের গণ্ডগোল হয়ে গেছে তাই! তা নাও তুমিই ফেরৎ নাও। হিসেব যখন জানি না, তখন যা লোকসান হয় আমারই হোক।

নাঃ লোকটার নির্লজ্জতার আর সীমা নেই। খুশি ঝাঁঝিয়ে ওঠে—না থাক। তোমার আর দু'আনা লোকসান করতে হবে না।

দুর্লভ কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—জয়ন্ত! জয়ন্ত! খুশির মনটা যেন নাড়া দিয়ে উঠল। এ কণ্ঠস্বর যেন তার বহুদিনের চেনা। সে-গলায় তখন আরও অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে—কোথায় গেল সে হতভাগা! সারা বাড়িতে একটাও জনমনিষ্যি নেই! মেয়েটাই বা গেল কোথায়? খুশি! খুশি!—

খুশি ততক্ষণ বেরিয়ে এসেছে ছুটে। কাকাবাবু এসেছে··· কাকাবাবু—খুশির আর হাসির অন্ত নেই। কণ্ঠস্বর চিনতে তার ভুল হয় নি একটুও। সামনেই দাঁড়িয়ে রায় বাহাদুর স্বয়ং! খুশি এসেই জড়িয়ে ধরে কাকাবাবুকে। বলে—বাবা! এই এতদিনে বুঝি আসা হল।

—হ্যাঁ, এতদিন বাদে আসা হল! কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলেন রায় বাহাদুর—কেন, আমি আসব কেন শুনি? আমার দায় পড়েছে আসবার! আমি এসেছি শুধু সেই হতভাগাকে একটু শিক্ষা দিতে! কোথায়···কোথায় সে?

—ওঃ, তুমি আমায় দেখবার জন্যে আসো নি তাহলে। খুশি ঠোঁট ফুলিয়ে রাগ দেখায়।

—আসি নিই ত! কিসের জন্যে আসবো? কি সম্পর্ক তোদের সঙ্গে?

খুশির চোখদুটো ছলছল করে এসেছে ততক্ষণে। কাকাবাবুর গলাব স্বরও তাই বোধ হয় আর্দ্র হয়ে আসে। মানে, কোন সম্পর্ক রেখেছে সেই হতভাগা, তোর দাদা! একটা খবর পর্যন্ত আমায় দিয়েছে এতদিনে? শেষে আমায় নিজে কি না ছুটে আসতে হল! কিন্তু যখন এসেছি তখন তোকে নিয়ে তবে আমি যাবো! দেখি সে হতভাগা কি করে।

—তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ কাকাবাবু?

—তা না হলে কি অমনি ছুটে এসেছি রে পাগলী! বাড়িটা আমার সেখানে যে খাঁ খাঁ করছে মা! দিনে রাতে আমার যে সেখানে সোয়াস্তি নেই।

কিন্তু দাদা যে যেতে দেবেন না! খুশি তাব মনের কথাটা জানিয়ে ফেলে কাকাবাবুকে।

—যেতে দেবে না মানে? দেখি তার কত বড় আস্পর্ধা যেতে না দেয় —সত্যিসত্যিই এবাব যেন চটে উঠেছেন রায় বাহাদুর— এখানে এই কেবত্তি মেয়েটাকে এনে কি ব্যবস্থা সে হতভাগা করেছে! কোন্ আক্কেলে এই দৈত্যপুরীর মত বাড়িতে এইটুকু মেয়েকে একলা ফেলে যায় সে হতভাগা! না, কোন কথা আমি শুনছি না। তুই এখুনি আমার সঙ্গে চল, দেখি সে কি করে। কাকাবাবু খুশির একটা হাতের মুঠো রীতিমত চেপে ধরে টান দেন। একি সঙ্কটে পড়ল খুশি! দাদাকে ফেলে সে কি করে চলে যাবে? দাদা এসে কি ভাববে? কি খাবে? কার সঙ্গে কথা বলবে? খুশির যেন মুহূর্তে কান্না পেয়ে গেল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও বললে, দাদা না এলে যেতে পারবো না কাকাবাবু।

—ওঃ যেতে পারবে না! যে ঝাড়ের বাঁশ সেই ঝাড়েরই কঞ্চি! ওই দাদাই তোমার সব হল! আর এই বুড়ো কিছু না! বেশ এই আমি চললাম; আর এই জন্মে যদি তোদের মুখদর্শন করি—

কাকাবাবু রাগে গটমট করে এগিয়ে গিয়েছিলেন দরজার দিকে। খুশি ছুটে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল—কাকাবাবু!

—না, আমি তোদের কাকাবাবু নই, কেউ নই। কোন সম্পর্ক নেই আমার তোদের সঙ্গে! কিন্তু সেই হতভাগার সঙ্গে একবার দেখা হলে—

কাকাবাবুকে কথা শেষ করতে হল না। তার আগেই খুশি বলে উঠল—ওই-ত দাদা আসছে। জয়ন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শিস্ দিচ্ছিল। সেই আওয়াজ শুনেই ও-কথা বলতে পারল খুশি আন্দাজে।

—আসছে! আসছে! আচ্ছা আমি দেখছি!

খুশির অনুমান মিথ্যে নয়। জয়ন্তই উঠে আসছে বটে সিঁড়ি দিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন রায় বাহাদুর। জয়ন্ত থমকে গেল কাকাবাবুকে দেখে।—একি কাকাবাবু কখন এলেন?

কাকাবাবুর মুখে তখনও রাগের ভাব স্পষ্ট। একটুও গলার স্বর নরম না করে কাকাবাবু আগের রাগ টেনে এনে বললেন, কখন এলাম, জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হয় না! খোঁজ নিয়েছ একবার? দিয়েছ একটা খবর? এ বুড়োকে একলা ফেলে এসে ভাইবোনে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে আছ! আর আমি সেখানে হা-পিত্যেশ করে মরি!

জয়ন্ত কাকাবাবুর রাগ দেখে কিন্তু টলল না। বললে, আপনিই ত ওখান থেকে চলে যেতে বলেছিলেন কাকাবাবু!

—হ্যাঁ বলেছিলাম,·· সে আমার ঘাট হয়েছে! অপরাধ হয়েছে! এখন জোড়হাতে বলছি এসব পাগলামি ছেড়ে ফিরে চল! ওখানে এবার যত খুশি স্বদেশী কোরো আমি কিছু বলবো না। মনে মনে হাসি পেল জয়ন্তর কাকাবাবুর এই ছেলেমানুষী দেখে। কিন্তু এত সহজে তার মন নরম হতে পারে না। এখানে রয়েছে মস্ত বড়

দায়িত্ব—নতুন খবরের ভার নিয়েছে সে। সৈনিকের কর্তব্য তার সামনে, সেখানে এই ক্ষুদ্র স্নেহ-ভালবাসার কোন স্থান নেই। তাই স্থির কণ্ঠেই বললে জয়ন্ত—তা ত হয় না কাকাবাবু!

—হয় না! কেন হয় না শুনি?

—বিদেশী আর স্বদেশী ত একসঙ্গে হওয়া যায় না কাকাবাবু। আপনি হোমরা-চোমরা সায়েব-সুবোর খোশামোদি করে কালো-বাজারের কারবার করবেন আর আমি সেই বাড়িতে থেকে স্বদেশী করবো এ ত হতে পারে না। তার চেয়ে আপনিই ওসব ছেড়ে এখানে আসুন না! দপ্ করে জ্বলে ওঠেন রায় বাহাদুর। এখন আর জয়ন্তর কাকাবাবু ন'ন তিনি। এখন তিনি রীতিমত রায় বাহাদুর। নেহাৎ নিজের ভায়ের ছেলে এই জয়ন্ত! না হলে··· না হলে···! অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন রায় বাহাদুর—কাজ-কারবার ছেড়ে আমি এখানে চলে আসব! মান সম্ভ্রম সব জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার সঙ্গে এসে স্বদেশী করব। না!

—সেই আশাতেই এখনো আছি কাকাবাবু। অল্প হেসে জয়ন্ত বললে।

—সেই আশাতেই আছ!—ওর হাসি দেখে আরও যেন জ্বলে উঠলেন রায় বাহাদুর!—আমি ত তোমার মত আহাম্মক নই। কখ্খনো কোন জন্মেও এখানে আসব না। এখন শুধু জানতে চাই, খুশিকে তুমি আমার সঙ্গে যেতে দেবে কি না!

—না কাকাবাবু, তা আমি পারি না।

—পারো না! বেশ, তোমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক আজ আমার শেষ। আমার মুখে তোমাদের নাম পর্যন্ত কেউ আর শুনতে পাবে না। রায় বাহাদুর নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। জয়ন্ত কোন কথা বলল না। শুধু চেয়ে রইল সেই দিকে। সৈনিক জয়ন্ত। খুশি এতক্ষণ নীরবে ছিল দাঁড়িয়ে। কাকাবাবু চলে যাচ্ছে অথচ দাদা

কিছু বলছে না। খুশি যেন কেঁদে উঠল—কাকাবাবু সত্যি আর আসবে না দাদা!

—আসবে রে আসবে। সময় হলে ঠিক আবার আসবে দেখিস্। খুশিকে লক্ষ্য করে জয়ন্ত নিজেকে সান্ত্বনা দিল কি না কে জানে?

প্রেসে যখন ফিরল জয়ন্ত, তখনও মনটা বেশ ভারি! চিন্তার একটা ঝড় বইছে মনে, কিংবা মনে হচ্ছে একটা নিক্তির ওজন চলেছে ভেতরে ভেতর। আর দুই পাল্লাই ভারি হয়ে উঠেছে দুদিক থেকে। মনটাও তাই ভারি। একটা প্রুফ তুলতে হবে তাড়াতাড়ি। কুঞ্জবাবুর লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রুফ। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এসে প্রুফ তুলতে লেগে গেল। ওর গম্ভীর মুখ ছোটেলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল না। ছোটেলাল প্রশ্ন করলে, কি জয়ন্ত ভেইয়া, মেজাজ খোশ নেই মালুম হচ্ছে! বলাই মনে করেছে কুঞ্জবাবুর লেখা পড়েই জয়ন্তর মেজাজটা ওরকম বিগড়ে গেছে। বলাই তাই জয়ন্তকে কথা বলতে না দিয়েই মন্তব্য করে—এডিটর সাবের লেখা পড়ে বোধ হয়। যা গরম লেখা, ধরলে হাত পুড়ে যায়! বলাইয়ের রসিকতা ছোটেলাল যেন লুফে নেয়। বলে হাঁ! এতো গরম! তবে ত হামার মেশিন গলে যাবে ছাপতে পারবো না। ওদের রসিকতা জয়ন্তকে পীড়া দেয় যেন। একেই ত সকাল থেকে মনটা ভারি। তার ওপর কুঞ্জর লেখা পড়ে সত্যি-ই মনটা খিঁচড়ে গেছে জয়ন্তর। বলাইয়ের অনুমান নেহাৎ মিথ্যে নয়। ওদের হাস্য-মুখর মুখ কালো করে দিয়ে জয়ন্ত বলে, সত্যি এ লেখা ছাপা না হওয়াই উচিত ছোটেলাল। কুঞ্জবাবুর লেখায় আগুন যত না আছে, ধোঁয়া আছে তার অনেক বেশি। আর সেই কথার ধোঁয়ার আড়ালে ওঁর যেটুকু বক্তব্য উঁকি দিচ্ছে, সেটা আমাদের বিরুদ্ধে বলেই মনে হয়। বলাই, ছোটেলাল এরা সব চুপ করে যায় জয়ন্তর কথা শুনে। জয়ন্তর কথাগুলোও খুব স্পষ্ট নয়। কী বলতে চায় সে? জয়ন্তও ওদের বুঝিয়ে দিতে চায় ব্যাপারটা স্পষ্ট করে। প্রুফ কপিটা তুলে নিয়ে বলে, এই

শোনো না কুঞ্জবাবু কি লিখেছেন—। ওরা শোনে। তবে জয়ন্তর কণ্ঠস্বর শোনে না, ওরা শুনতে পায় আরও এক প্রবলতর স্বর। সে স্বর কুঞ্জর। কুঞ্জ হাঁক দেয়—কি, হচ্ছে কি তোমাদের? কাজের লোক কুঞ্জ। আড্ডা ইয়ারকি বরদাস্ত করবার পাত্র সে নয়। জয়ন্তর দিকে এগিয়ে এসে বলে, তোমায় কখন বলেছি না প্রুফ আনতে! জয়ন্তর স্বর স্থির হয়ে আসে। বলে, এই লেখাটা একটু পড়ে দেখছিলাম।

কুঞ্জর স্বরে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গ।—পড়ে দেখছিলে? কি দেখলে পড়ে?

—দেখলাম এ লেখা আমাদের কাগজে বার হওয়া উচিত নয়। জয়ন্তর স্বর আগের মতই স্থির। কুঞ্জ দপ্ করে ওঠে—ও, কাগজে কি বার হবে না হবে, তার বিচার করবে তুমি! তোমার হুকুম মত আমায় লিখতে হবে! get out! বেরিয়ে যাও এখুনি এ প্রেস থেকে····বেরিয়ে যাও! কুঞ্জর গলা ত নয় সারা বাড়িটা যেন ঝন ঝন করে ওঠে। প্রণতি ছুটে আসে। বলে, দাঁড়ান জয়ন্তবাবু যাবেন না! জয়ন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রণতির কথায় দাঁড়াল।

কুঞ্জ বললে—যাবে না মানে! জানো ওর কত বড় আস্পর্ধা, আমার লেখা কাগজে যাবে কি না যাবে, তার বিচার করবে ও!

প্রণতি অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাল কুঞ্জর দিকে। একটুও রাগ করল না। গলার স্বর করল না একটুও উচ্চ। বললে, উনিও যখন এ কাগজের একজন, সে অধিকার ওঁর আছে।

—অধিকার আছে! তুমি বলছ অধিকার আছে! থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করলে কুঞ্জ।

—হ্যাঁ, বললাম!

কুঞ্জর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল নিমেষে! খানিকটা সংযত

হয়ে কুঞ্জ বললে, ও! আমিও তাহলে জানিয়ে দিচ্ছি, উনি যদি প্রেসে থাকেন, আমি থাকবো না! কথাটা বলবার পর এক মিনিট স্তব্ধতা। কুঞ্জ সবার দিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কিছু বলছে না। কেউ বিচলিত হয় নি পর্যন্ত। কুঞ্জ আবার বললে, আমি আবার বলছি প্রণতি, এখানে ওকে যদি রাখতে চাও, আমায় তাহলে পাবে না! সকলে নিরুত্তর। প্রণতিও। মাটির দিকে চাইল কুঞ্জ।—ও, উনিই তাহলে থাকবেন ··আমি তাহলে চলে যাচ্ছি।—আমি চলে যাচ্ছি! বুঝতে পারছ! প্রণতির দিকে তাকিয়ে বলে কুঞ্জ।

জবাব দেয় ছোটেলাল।—না গেলে কেমন করে বুঝবো কুঞ্জবাবু! আপনি ত খালি খাড়া হয়ে 'যাচ্ছি, যাচ্ছি' বলে চিল্লাচ্ছেন। যাচ্ছেন কই!

অগ্নিময় দৃষ্টিতে একবার তাকায় কুঞ্জ ছোটেলালের দিকে, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। কুঞ্জ বুঝেছে কথা কইবার আর প্রয়োজন নেই। বলাই বলে, আরে এডিটর সাব যে সত্যি সত্যি চলে গেলেন। বলাইয়ের চোখে স্বস্তি আর বিস্ময় মাখানো।

চেঁচামেচি শুনে নিবারণবাবুও এসে পড়েছিলেন। জয়ন্ত নিবারণবাবুকে উদ্দেশ্য করেই বললে, সত্যি ব্যাপারটা খুব খারাপ হল। আমারই অন্যায় হয়েছে ওকে এমন করে সমালোচনা করা!

—না, তোমার কোন দোষ নেই বাবা। কিন্তু আমি ভাবছি কাল থেকে আর কাগজ বার হবে না। জয়ন্ত চুপ করে গেল। নিবারণবাবুর কথা ত নয়, যেন দীর্ঘশ্বাস! ছোটেলাল বললে, কেন? কাগজ বার হবে না কেন? আমরা কি করতে আছি!

—তোমরা আছ জানি, কিন্তু লেখবার লোক কই। এবার খটকা লাগে ছোটেলালের। একবার প্রণতি আর একবার জয়ন্তর দিকে তাকায়। দুজনেই মাটির দিকে চেয়ে। আরও অসহায় বোধ করে ছোটেলাল।

নিবারণবাবুও কম অসহায় বোধ করছেন না। মনে হচ্ছে একটা বিরাট ধ্বস নেমেছে কোথায়। যে পাহাড়ের মাথায় ছিল স্তরের পর স্তর বরফ, যে মাথা ঝলসে উঠেছিল প্রথম রোদে, সেই বরফের স্তূপ ধ্বসে পড়ছে এক সময়ে—ঝরে পড়ছে ভয়ঙ্কর স্রোতে দিকে দিকে। তাকে রোধ করতে পারে না কেউ, কেবল সরে যেতে হয়, পথ ছেড়ে দিতে হয়, না হলে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে, মুছে যেতে হবে শীতল সঙ্ঘর্ষে।

নিবারণবাবু বসে আছেন নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ। সমস্ত চিন্তা যেন তার ফুরিয়ে গেছে। মনটা ঘিরে যেন এক শূন্য রাত্রি···অনেক ঝড় গেছে, অনেক তুফান—বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি নতুন খবরকে, বহু ঝড়ে, বহু প্লাবনে নতুন খবরের এতটুকু স্ফুলিঙ্গকে নিভতে দেন নি তিনি। কিন্তু আজ নিশ্চিতরূপে আয়ু শেষ হয়ে গেল তার। সব আয়োজন, সব উপকরণ ব্যর্থ হয়ে গেল। শেষে কুঞ্জ এই করলে! করতে পারলে। শুধু নিবারণবাবুর মনে হয়, বাইরেও তখন রাত্রি নেমেছে। রাত্রি নেমে গভীর হতে চলেছে। নিবারণবাবুর হঠাৎ মনে হল প্রণতির ঘরে আলো জ্বলছে। কি করছে ও এত রাত্রে? হঠাৎ এই জিজ্ঞাসা যেন চিন্তার সমস্ত কুহেলী ছিঁড়ে আবিষ্কার করে ফেলল নিবারণবাবুকে। নিবারণবাবু উঠে এসে দাঁড়ালেন প্রণতির ঘরে।—প্রণতি! প্রণতি! এখনও জেগে আছিস এত রাত্তির পর্যন্ত? কি করছিস? ঘুম আসছে না তোর? এতগুলো প্রশ্নে চমকে গেল প্রণতি। হাতের কাগজ কলম সরিয়ে রেখে বললে, তুমিও ত ঘুমোও নি বাবা! এক ফালি স্নিগ্ধ হাসি ফুটল প্রণতির ঠোঁটে।

—হ্যাঁ, তা ঘুমোই নি বটে।—একটু থামলেন নিবারণবাবু, তারপর আবার বললেন, কি জানিস মা? যত ভাবছি, ঘুম কিছুতেই আসছে না—নিজেদের কাগজ চালানো বোধ হয় আর হল না!

প্রণতি আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।—এত হতাশ হবার কিছু হয় নি বাবা।

—হয়েছে বই কি মা। কি করে আর কাগজ বার হবে। প্রেসের দেনা বাকি রাখতে পারি, কিন্তু লেখবার লোক না হলে কাগজ কি করে চলবে? কুঞ্জবাবুকে যেতে দেওয়াই আমাদের ভুল হয়েছে!

—না বাবা ভুল হয় নি—স্থির শান্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রণতির কণ্ঠে—কুঞ্জবাবুকে ধরে রাখলে, যারা প্রাণ দিয়ে এ কাগজকে ভালবাসে তাদের কাউকে যে ধরে রাখতে পারতে না!

—কিন্তু শুধু তাদের দিয়ে ত কাগজ চলে না, লেখবার লোকও ত চাই। নিবারণবাবুর স্বর অপ্রত্যাশিত রকমের অসহায় শোনাল।

—কুঞ্জবাবু ছাড়া কি আর লেখবার লোক নেই!

—থাকবে না কেন? অনেক আছে। কিন্তু এ গরীবদের কাগজে নামমাত্র পয়সায় তারা লিখতে আসবে কেন?

—যদি না আসে তাহলে গরীবদের কথা নিজেদেরই লিখতে হবে। সে লেখায় পালিশ না থাক অন্ততঃ ফাঁকির খাদ থাকবে না।

—সবই ত বুঝলাম! কিন্তু সে রকম লেখাও পাচ্ছি কোথায়?

—আমি যদি লিখি! কথা বলল না প্রণতি, যেন চ্যালেঞ্জ করল।

—তুই লিখবি? পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন নিবারণবাবু।

—কেন বাবা! মেয়েরা কি এসব লিখতে পারে না!

—কেন পারে না, খুব পারে। কিন্তু তুই ত কখনও লিখিস নি মা। লেখাও যে শিখতে হয়!

—তা আমি জানি বাবা। লিখতেও আমি শিখেছি।

—লিখতে শিখেছিস? কার কাছে? হঠাৎ যেন রাত্রি ভোর হয়ে গেছে বলে মনে হল নিবারণবাবুর।

—তোমার কাছে!

—আমার কাছে! আমি আবার কবে শেখালাম। আমি কি ছাই নিজেই লিখতে পারি?

—লিখতে হয়ত তুমি পার না বাবা! কিন্তু তোমার মত খাঁটি লোকেরা যা ভাবে, যা কল্পনা করে, পেশাদারের কলমে একটু সাজানো গোছানো ভাষায় তাই সাহিত্য হয়ে ওঠে।

প্রণতিকে দেখাচ্ছে জানালা দিয়ে দেখতে-পাওয়া আকাশের উজ্জ্বল তারাটার মত। একটু হেসে নিবারণবাবু বললেন, দূর পাগলী! নিজের বাবা বলে অতটা একচোখো হস নি—। প্রণতিও হাসল—। আমি ঠিক কথাই বলছি বাবা। কেমন করে লিখতে হয়, না শিখলেও, কি লিখতে হয় তা তোমার কাছেই শিখেছি।—একটু কি ভেবে নিল প্রণতি, তারপর বললে, দেখবে বাবা আমি কি লিখেছি? প্রণতি আবার সরে গেল টেবিলের দিকে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে এল একগোছা কাগজ।—এই নাও।

নিবারণবাবু পড়তে শুরু করেন। তখনও স্নেহের হাসি লেগে ছিল ওঁর মুখে। পড়া যখন শেষ হল তখন তাঁর মুখে গর্বের আলো! নিবারণবাবুর মনে হল, প্রণতিকে আজ নতুন করে চিনলেন তিনি। যাচাই করে নিলেন নিজের মেয়ে বলে।

—তুই এ সব লিখেছিস্! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না!

—ভালো হয়েছে বাবা?

—ভালো হয়েছে মানে? এসব কথা এর চেয়ে ভালো করে কে লিখতে পারে? লিখুক দেখি কে আছে?

প্রণতি আর দূর আকাশের তারা নয়, হাতের কাছের রাত্রির অপূর্ব শ্রীমণ্ডিতা পৃথিবীর মত। যে রাত্রি আগামী ভোরের জন্ম দেয়। প্রণতি কথায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—নিজের মেয়ে বলে অতটা একচোখো হয়ো না বাবা। সত্যি করে বল, এ লেখা চলবে কি না!

—চলবে রে চলবে। এমন চলবে যে, সকলের চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। কাল সকালে এই লেখা দিয়েই কাগজ বেরুবে।

আশীর্বাদের মত করে বললেন নিবারণবাবু। হঠাৎ একটা শব্দে ওদের একান্ত আলাপ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে-শব্দ অতিপরিচিত ওদের কাছে। যে শব্দের নীরবতা ওদের পীড়া দিচ্ছিল এতক্ষণ। হ্যাঁ, ওরা বিস্মিত হয়ে শুনল এত রাত্রে মেশিন চলে উঠেছে। ঘটাঘট্ ঘটাঘট্! ঘটাঘট্ ঘটাঘট্! নিবারণবাবু যেন চমকে উঠলেন—এত রাত্রে মেশিন চালায় কে? তাড়াতাড়ি নিবারণবাবু ছুটে এলেন মেশিনঘরের দিকে। প্রণতিও এল। নিবারণবাবুর হাতে প্রণতির লেখা কাগজগুলো গোল করে পাকানো। মেশিনঘরে আলো জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে ছোটেলাল আর জয়ন্ত কি যেন ছেপে চলেছে!···কি ব্যাপার কি! এত রাত্রে মেশিন চালাবার মানে?

জয়ন্ত আর ছোটেলাল চেয়ে দেখল নিবারণবাবুর দিকে। ছোটেলাল নির্বিকার হয়েই বললে—মানে বুঝতে পারছেন না? নতুন খবর ছাপা হচ্ছে; রাত্রে না ছাপালে কাল কাগজ বাহার হোবে কি করে?

—কাগজ ত কাল বার হবে, কিন্তু নতুন খবর ছাপছ কি নিয়ে? সম্পাদকের লেখা ছাড়াই নতুন খবর বেরুবে নাকি? অসহিষ্ণু শোনাচ্ছে নিবারণবাবুর স্বর।

ছোটেলাল একটুখানি হাসল—তা কেনো হোবে? দেখেন না পড়ে! ছোটেলাল একখানা কাগজ তুলে দেয় নিবারণবাবুর হাতে। প্রণতিও এক কপি গ্রহণ করে জয়ন্তর হাত থেকে। নিয়ে পড়তে শুরু করে। নিবারণবাবু তখনও অসহিষ্ণু হয়ে রয়েছেন। কাগজ না পড়ে তিনি বলেন, পড়ে কি দেখব, কার লেখা তুমি ছেপেছ?

ছোটেলাল একবার জয়ন্তর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়; তারপর বলে, আছে কোই বড়া লিখনেওয়ালা।

—না না, তুমি ছাপা বন্ধ কর ছোটেলাল। ও সব বাজে লেখা বাতিল করে, আবার নতুন করে সব ছাপাতে হবে। এই নাও

তোমার কপি। কে লিখেছে জানো ছোটেলাল? তোমার দিদিমণি। হাতের পাকানো কাগজগুলো এগিয়ে দিয়ে এতক্ষণে অল্প হাসেন নিবারণবাবু।

—প্রণতি দেবী লিখেছেন! সত্যি ছাপা বন্ধ কর ছোটেলাল! —ফর্মা খুলে ফেল। বলে উঠল জয়ন্ত।

—বেশ তাই ফেলছি।

—না, না, দাঁড়াও ছোটেলাল, ফর্মা খুলতে হবে না। বাধ দেয় প্রণতি!

—খুলতে হবে না! নিবারণবাবু বিস্মিত প্রশ্ন করেন।

—না বাবা। এ লেখা কার, জানি না কিন্তু তাঁকে সত্যি নমস্কার জানাচ্ছি। দেখি বাবা আমার লেখাটি,—প্রণতি ফস্ করে নিবারণবাবুর হাত থেকে ওর লেখা কাগজগুলো নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয় মাটিতে।

—ও কি করছেন? জয়ন্ত হৈ হৈ করে ওঠে!

—ও কি করছিস মা?

—ঠিকই করছি বাবা। এ লেখার কাছে আমার লেখার এই ছেঁড়া কাগজের বেশি কোন দাম নেই।

—কিন্তু এ লেখা কোথায় পেলে ছোটেলাল? শুধু একবার এ রকম লিখলে ত চলবে না! হপ্তায় হপ্তায় এ লেখা আমরা পাব কোথায়? নিবারণবাবু যেন সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলছেন—এমন করে বলেন।

—পাবেন এখান থেকেই। লিখনেওয়ালা আপনার সামনেই খাড়া আছে।

—তুমি! জয়ন্ত! নিবারণবাবুর যেন বিস্ময়ের আর অন্ত নেই!

—আপনি লিখেছেন! প্রণতির বিস্ময়ের চেয়েও অন্য আর এক আলোয় যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—কাল কাগজ বেরোবে না ভেবে সাহস করে একবার লিখি ফেলেছি।

—একবার লিখে ফেলেছেন! কিন্তু একবার লিখেই শুকিয়ে যাবার কলম ত আপনার নয়।

জয়ন্ত প্রণতির কথা শুনে একবার ভাল করে তাকাল ওর দিকে। প্রণতি কি চিনতে পেরেছে লেখক জয়ন্তকে?

—যাক্ আমাদের সম্পাদকের ভাবনা তাহলে এখন থেকে ঘুচল। আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে বলেন নিবারণবাবু।

প্রণতি একটু হাসে। বলে, তা ঘুচল, তবে কাজ বাড়ল প্রুফ-রিডারের।

জয়ন্ত আর নিবারণবাবুর কণ্ঠস্বর একসঙ্গে শোনা যায়—প্রুফ-রিডারের কাজ বাড়ল?

প্রণতি আবার হাসে আর মাথা দোলায়—হ্যাঁ, বেশ ভাল একজন প্রুফ-রিডার আর তারই সঙ্গে একটি ডিক্‌শ্‌নারি! যাক্ আপাততঃ আমিই প্রুফ দেখে দিচ্ছি।

প্রণতি প্রুফ দেখার টেবিলে গিয়ে বসে জয়ন্তর লেখা নিয়ে। খানিক পরে জয়ন্ত গিয়ে হাজির হয় প্রণতির কাছে।— কি, এখনো ওইটুকু প্রুফ দেখা হল না?

—যা গণ্ডা গণ্ডা ভুল, হবে কি করে? মাথা না তুলেই জবাব দেয় প্রণতি।

—খুব ভুল করেছে বুঝি? এরা কি যে কম্পোজ করে! জয়ন্ত প্রণতির বিরক্তি নিজের কণ্ঠে মেলাতে চায়।

—কম্পোজ ঠিকই করেছে। যা বানান পেয়েছে তাই তো করবে।

—তার মানে আমি বানান ভুল করেছি?

—তাই তো দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে তাকিয়ে দেখে প্রণতি জয়ন্তর দিকে। প্রণতির দুষ্টু-দুষ্টু হাসিতে বুকের ভেতরটা কেমন

করে ওঠে জয়ন্তর। বলে—কখ্‌খনো নয়—দেখি। জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে দেয় প্রণতির দিকে। কিন্তু প্রণতি প্রুফটা আরও গুটিয়ে নেয় নিজের দিকে। বলে, উঁহু দেখে কি হবে। শুনুন···মানব সভ্যতার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ··বানান করুন ত 'মুহূর্ত' ?

—'মুহূর্ত' বানান আমি জানি না—? জয়ন্ত রাগের ভান করে।

—জানলে আর বানান করতে ভয় কি ? নাঃ, প্রণতি আজ ঝগড়া করবে বলে কোমর বেঁধেছে।

জয়ন্ত বলে—ওঃ, আমি যেন সত্যি ভয় পেয়েছি! ভারি ত বানান— ম এ উ হ-এ উ····প্রণতি একটু কপাল সিঁটকোয় আর মাথা নাড়ে।

জয়ন্ত এবার সত্যি একটু ভয় পায়। তাড়াতাড়ি শুধরে নেয়—না না, হ-এ উ—প্রণতি হাসে আর মাথা দোলায়—তবু হল না।

—হল না ত হল না—ভারি ত একটা বানান।

—একটা নয়—অমন ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল আপনার কপিতে।

—হতেই পারে না আমি দেখবো। জয়ন্ত আবার কেড়ে নিতে চায় কপি।

—উঁহু। আগে বানান করুন 'দ্বন্দ্ব···বানান করুন 'সমীচীন'—

—না, আমি আগে দেখবো কি লিখেছি—জয়ন্ত টেবিলের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়

– না। এই যে শুনুন না কি লিখেছেন—শান্তিপ্রিয়তার অর্থ নিষ্ক্রিয় জড়তা নয়। দানবদের হাতে সমস্ত সভ্যতা সংস্কৃতি যখন বিপন্ন, তখন আত্মরক্ষার আয়োজনও যাঁরা সমীচীন নয় বলে মনে করেন—কই বানান করলেন না সমীচীন—

বলছি আগে দেখবো—প্রণতি জয়ন্তকে এড়িয়ে গিয়ে কপি নিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু জয়ন্ত জানলার ধারে কোণঠাসা করে ধরে ওকে। বলে, কই দেখি এবার কি ভুল।

হাসিতে উজ্জ্বল হয়েই আত্মসমর্পণ করে প্রণতি। বলে, এই

নিন দেখুন। আপনি ভাল লেখেন মানি, কিন্তু বানান কিছু জানেন না।

—কেন, এই ত স ম-এ ই চ-এ ই ন—সমিচিন···

—আজ্ঞে না মশাই, দুটোই ঈ হবে আর দ্বন্দ্বে দুটোই ব' ফলা আছে—

—আছে ত আছে! আমি ত আর দ্বিতীয় ভাগের পরীক্ষা দিতে বসি নি—! এবার জয়ন্তর হার মানার পালা।

—শোধরাবার লোক ত রয়েছে! অম্লানবদনে বলে দেয় জয়ন্ত।

—কে? আমি? ও আমি বুঝি চিরকাল ধরে আপনার ভুল শোধরাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে থাকবো?

হঠাৎ জয়ন্তর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। হ্যাঁ, চিরকালই যদি থাকো। সে আশা করাটা কি খুব অন্যায়! জয়ন্ত এক গভীরতর দৃষ্টিতে তাকায় প্রণতির চোখের দিকে। কনেকক্ষণ কোন সাড়া দেয় না প্রণতি। নীরবতা তার যেন বেশী মুখর হয়ে উঠেছে। খানিক পরে হঠাৎ বলে, কি রকম মেঘ করেছে দেখেছেন—? বাইরের আকাশ কখন যেন অজস্র মেঘে ভরে গেছে। জয়ন্ত মেঘের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। তারপর বলে, বাইরের মেঘ দেখে নষ্ট করবার সময় আমার নেই!

'নতুন খবর' অফিস থেকে রাগারাগি করে বেরিয়ে কুঞ্জ সোজা হাজির হল ধরণীধরের অফিসে। হঠাৎ যে তার সঙ্গে নতুন খবরের সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাবে, তা সে কল্পনাই করতে পারে নি। অনেকটা নিজের ব্যবহারে নিজেই যেন সে অবাক বোধ করতে লাগল। এত সহজে প্রণতিকে চটিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। তাছাড়া, প্রণতিও একবার তাকে বলল না, 'যাবেন না'! কোন রকম হাঁ-না কিছুই বেরুল না ওর মুখ দিয়ে। আর ঐ নতুন ছোকরাটা!—জয়ন্ত? কুঞ্জ একবার হাত দুটো মুঠো করে যেন ঘুঁষি মারতে চাইল ওকে।

ধরণীধরের ঘরে মনোহর এসেছে। তাছাড়া রয়েছে ওঁর স্টেনো স্টেলা আর ওঁর কাগজের মহিলা-মহলটা যিনি দেখাশুনা করেন সেই বিচিত্ররূপিনী সবিতা দেবী। ধরণীধর অবাক হলেন কুঞ্জর কথা শুনে। এতদিনের যার সম্পর্ক নতুন খবরের সঙ্গে, তাকে কিনা সব সম্পর্ক চুকিয়ে আসতে হল! অবাক হলেও মনে বাঁকা হাসি হাসছিলেন ধরণীধর। বললেন, নতুন খবর তাহলে আপনি ছেড়ে দিয়ে এলেন। কুঞ্জকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে মনোহর বলে উঠল, আজ্ঞে যা অপমান ওঁকে করেছে। তারপর আর উনি থাকতে পারেন? আপমান কথাটা শুনে কুঞ্জ আরও যেন চটে গেল। কুঞ্জ অপমানিত হয়ে চলে এসেছে এ কথা বলতে দেবে না সে আর পাঁচজনকে! বললে, অপমান! অপমান তুমি কোথায় দেখলে মনোহর? মনোহর চতুরতার সঙ্গে সামলে নিলে ব্যাপারটা। স্বরটা নরম করে বললে, না, এই মানে—আপনার মর্যাদা ওরা ত ঠিক বোঝে না!

—হ্যাঁ।—অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে কুঞ্জ—হ্যাঁ, তাই নিজের খুশিতে ছেড়ে দিলাম! ভারি ত একটা রোথো সাপ্তাহিক! এতদিন যে ওখানে ছিলাম সেই ওদের ভাগ্যি। ধরণীধর বললে, তা এতদিন যখন ছিলেন, আর কিছুদিন ওদের ওপর অনুগ্রহ করলেই ত পারতেন। সবিতা দেবী ধরণীধরের কথাটা আরও একটু বিশদ্ করে বলেন, হ্যাঁ, অন্তত এই ইলেক্শনের সময়টা কলমের মজুরী পুষিয়ে বেশ মোটা কিছু উপরি হয়ে যেতে পারত। এই ত লোটবার মরসুম। মেয়েলী কণ্ঠে ব্যবসাদারী কথাটা কেমন যেন শোনাল। হাঁ করে চেয়ে রইল কুঞ্জ ওর দিকে খানিকক্ষণ।

ধরণীধর সেই নীরবতার সুযোগ নিয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন, হ্যাঁ, ভাল কথা সবিতা, কি খবর তোমাদের মহলের? মেয়েদের মন গলছে একটু আধটু?

—আপনাদের আগুনের আঁচই নেই তা গলবে কি।—রীতিমত

কাব্য করে বলতে শুরু করলেন সবিতা দেবী—যোগজীবন সমাদ্দার ত আর গোকুলের কানাই নয় যে নাম শুনেই মেয়েরা ঢলে পড়বে।

—আহা, তাহলে তোমার মত বৃন্দে দূতী লাগিয়েছি কি করতে। কানাকে কানাই করতে যদি না পারলে ত কিসের তোমাদের ছলাকলা। ধরণীবাবুও বেশ সরস করে বলতে ছাড়েন না। একটু যেন হতাশ হয়ে বললেন সবিতা দেবী—সেদিন আর নেই। মেয়েরাও আর শুধু কানে শুনে মূর্চ্ছা যায় না, চোখে ভাল করে চেয়ে দেখে। ওই যে কুঞ্জবাবু ছেড়ে দিলেন, এখন নতুন খবরের ছোবল সামলাবেন কি করে? ওই রোখো কাগজের বিষও কম মনে করবেন না। ফাঁকা হাসি খেলে গেল ধরণীধরের মুখে। ধারালো হাসি। বললেন, বিষ দাঁত ভাঙবার অস্ত্রও আছে। তারপর স্টেলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘরোয়া প্রশ্ন করলেন,—নবজীবন প্রেসের প্রায় সব কটা মেশিনই আমাদের কাছে নেওয়া, না?

—হ্যাঁ।

—এখনও কটা কিস্তি বাকি আছে দেখলে সেদিন?

—এখনও তিনটে বাকি।

চোখ দুটো চকচক করে উঠল ধরণীধরের। চোখ দিয়ে কি হাসছেন তিনি। বললেন, দুদিন চুপ করে থাক। তারপর একটু বেচাল দেখলেই টুঁটি চেপে ধরবে। তুলে আনবে সমস্ত মেশিন। কুঞ্জ হঠাৎ নিজের থেকেই বলে উঠল—ও মশা মারতে কামান দাগবার দরকার হবে না স্যর। ছেড়ে যখন এসেছি তখন নতুন খবরের বারোটা আপনি বেজে গেছে। কুলি মজুর দিয়ে শুধু মেশিন চালালেই ত হবে না, লিখবে কে শুনি, বলি কাগজ লিখে চালাবে কে?—উত্তরোত্তর গলা চড়িয়ে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে থাকে কুঞ্জ।

কুঞ্জর ধারণা ভুল। কুঞ্জ ছেড়ে আসায় এতটুকু ক্ষতি হয় নি নতুন

খবরের। উপরন্তু কাটতি বেড়ে গেছে কাগজের। জয়ন্তর কলম তরবারির মত শাণিত আর উজ্জ্বল। বহুদিন পরে মনের মত সুযোগ পেয়েছে সে। মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলে সে আগুন লাভাস্রোতের মত ছড়িয়ে পড়েছে কলমের সূক্ষ্ম সোনালী মুখ দয়ে। নিবারণবাবু উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কথাটা বার বার করে বলেন, আমাদের কাগজের কাটতি ভয়ানক বেড়ে গেছে—ভয়ানক বেড়ে গেছে।·· নিবারণবাবুর স্বপ্নও বুঝি সফল হতে চলল। প্রণতির চোখেও খুশির আলো চমকায়। বলে, তাহলে সবাই খুব পড়ছে বল ?

—পড়ছে না শুধু, পোড়াচ্ছেও। একটু যেন হেঁয়ালির মত শোনায় নিবারণবাবুর কথা।

—পোড়াচ্ছেও! জয়ন্ত অবাক হয়।

—হ্যাঁ, যোগজীবন সমাদ্দারের দল যেখানে আমাদের কাগজ পাচ্ছে. কিনে কেড়ে যেমন করে হোক নিয়ে পোড়াচ্ছে।

জয়ন্ত এবার হাসে। বলে, তা পোড়াক ক্ষতি নেই। আমাদের কাগজ পড়লেও আগুন, পোড়ালেও আগুন। কথাটা শেষ করে একটু যেন গম্ভীর হয়ে পড়ে ও। চোখের দৃষ্টিটা যেন সামনের থেকে সরে যায় দূরে দূরে। একটু থেমে, মৃদুভাবে বলে জয়ন্ত, শুধু এটাকে যদি দৈনিক করে তোলা যেত।

—আপনি এর মধ্যে দৈনিকের স্বপ্ন দেখছেন ? প্রণতিও স্বপ্ন-স্বপ্ন গলায় বলে।

—নিশ্চয় দেখছি, আজ যা স্বপ্ন, কাল তাই সত্য হবে না কে বলতে পারে ? জয়ন্তর স্বরে কঠিন প্রতীতি। হঠাৎ একটা কোলাহল শোনা যায় মেশিনঘরের দিক থেকে। কারা যেন এদিকে আসছে কি বলতে বলতে। আসছে বলাই আর মনোহর! বলাই চীৎকার করে, নিবারণদা, নিবারণদা! এই যে নিবারণদা! তুমি একবার হুকুম দাও, শালাদের একেবারে ঠাণ্ডা করে দি।

—কি হয়েছে কি ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন নিবারণবাবু।

—এতবড় আস্পর্ধা, শালারা বলে কি না মেশিন তুলে নিয়ে যাবে! বাগে যেন হাঁপাতে থাকে বলাই।

—কে মেশিন তুলে নিয়ে যাবে? জয়ন্ত প্রশ্ন করে এবার। মনোহর বলে, ওই আপনাদের ধরণীবাবুর অফিসের লোক। প্রেসের কিস্তির টাকা বাকী আছে না। একেবারে ভালোমানুষটির মত বলে মনোহর। যে মনোহর গোপনে গোপনে ধরণীবাবুর চর।

—বাকী আছে ত হয়েছে কি? থাক বাকী?···এ শুধু নতুন খবর বন্ধ করার ফন্দি। তা আর আমরা বুঝি না। তুমি শুধু একবার বলে দাও, মেশিন কে ছোঁয় একবার দেখি। বলাই উত্তেজনায় একেবারে ছটফট করতে থাকে। নিবারণবাবুর মুখে চিন্তার ছায়া নামে। শান্ত স্বরে বলেন, না না ওসব গোলমালের কাজ নেই বলাই। আমি বরং একবার ধরণীবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

বলাই হতাশ হয়। বলে, তাহলে এস তাড়াতাড়ি, নইলে আমার আবার চড়া বায়ুর ধাত···হঠাৎ কি করে বসি বলতে পারি না।

জয়ন্ত বলে, আপনার বদলে আমি একবার দেখা করতে যেতে পারি ধরণীবাবুর সঙ্গে? যে ধরণীধরের এত প্রতিপত্তি, এত প্যাঁচ, তাকে একবার দেখতে চায় জয়ন্ত। কী ধরণের মানুষ সে?

—তুমি যাবে? নিবারণবাবু কুতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকায় জয়ন্তর দিকে।

—হ্যাঁ। এখানে এসে অবধি শুধু তাঁর নামই শুনেছি, তাই একবার স্বচক্ষে মহাপুরুষকে দেখতে চাই।

জয়ন্ত ধরণীধরের আফসে পেঁছবার আগেই মনোহর এসে পেঁছয় খবরটা পেঁছে দিতে। মনোহর বেশ অঙ্গভঙ্গী করে খবরটা দেয়—আজ্ঞে তেল একটু মরেছে বই কি স্যর। মেশিন তুলে আনার পরোয়ানা দেখেই ত জয়ন্তবাবু দেখা করতে আসছেন। কুঞ্জ উপস্থিত ছিল অফিসে। বলে, ওই জয়ন্ত ছোকরাটি আসলে একটি বিচ্ছু। ওই ত যত নষ্টের মূল।—বলতে বলতে কুঞ্জর হাত দুটো আপনিই

মুঠো হয়ে আসে—তারপর ধরণীধরের দিকে চেয়ে বলে, যতই হাতে পায়ে ধরুক, আপনি কিন্তু কিছুতেই নরম হবেন না। উপদেশ শোনবার কোন প্রয়োজন নেই ধরণীধরের। কুঞ্জর কথায় কপালটা কুঁচকে ওঠে ওঁর। বললে, নরম না গরম হয় সেটাও কি আপনার কাছে শিখতে হবে কুঞ্জবাবু? কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় কুঞ্জ হাত কচলে বলবার চেষ্টা করে—না, মানে আমি বলছিলুম—কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলবার আগেই থামতে হয় কুঞ্জকে। অবনীবাবু ঘরে এসে খবর দেন। নবজীবন প্রেস থেকে জয়ন্তবাবু দেখা করতে এসেছেন।

—যান আপনারা ওঘরে, আর মনে থাকে যেন যা যা বলে দিয়েছি। মনোহর আর কুঞ্জর দিকে কথাগুলো বলে অবনীর দিকে চেয়ে ধরণীধর বলেন, পাঠিয়ে দিন। জয়ন্তর কণ্ঠস্বর শোনা যায় দরজার ওপাশ থেকে, আসতে পারি?

—আসুন।

জয়ন্ত ঘরে এসে বসে। বলে, আমি নবজীবন প্রেস থেকে আসছি।

—নবজীবন প্রেস! একটু যেন ভেবে নিয়ে ধরণীধর বলেন, ও যেখান থেকে নতুন খবর বেরোয়? আপনিই তাহলে নতুন খবরের সম্পাদক জয়ন্তবাবু!

—হ্যাঁ।

বাইরে থেকে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল। যেন একটা ভারি মাল নিয়ে কয়েকজন লোক ধস্তাধস্তি করছে—এই ইধর লে আও—আরে নামা না একটু আস্তে—এই পাকড়ো ঠিকসে। আরে ফেকো মাৎ—মিশ্রিত একটা গোলযোগ শোনা যাচ্ছে এইরকম একটু থেমে ধরণীধর বললেন, মাপ করবেন, দেখে আসি একটু—বলতে বলতে উনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। জয়ন্তও বেরিয়ে এল বারান্দায়। দেখল একটা বড় প্যাকিং বাক্স নিয়ে চারজন কুলি

টানাটানি করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। নামাতে পারছে না ঠিকমত। আর কয়েকজন বাবু গোছের লোক কেবলই চেঁচাচ্ছে, হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে, মাতব্বরি করছে—আরে এদিকে একটু সরিয়ে....না না... আরে পাকড়ো ঠিকসে...ইধার লে আও—একটু আস্তে—ধরণীধর পিছন থেকে এসে যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।—কি ব্যাপার কি! একটা বাক্স নামাতে সমস্ত অফিস যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। ওদের মধ্যে থেকে একজন বাবু বলে, আজ্ঞে, ভয়ানক ভারি কি না। কুলিরা সামলাতে পারছে না।

—কুলিরা সামলাতে পারছে না ত আপনারা কি করছেন? ও, আপনারা সব বড়বাবু যে। মোটে হাত দিলে আপনাদের মান যায়। কথা শেষ করেই ধরণীধর এগিয়ে আসেন কুলিদের দিকে। সামনের কুলিকে বলেন, এই হটো, উধার যাও। কুলিকে পিছনে পাঠিয়ে সামনের দিকটা নিজেই কাঁধ লাগিয়ে চাড়া দিয়ে ঠেলে ধরেন। তাঁর সুগঠিত দেহ, কুঞ্চিত-পেশিতে যেন ঢেউয়ের মত দেখায়। তারপর, অতি সহজে নেমে আসে বাক্সটা। সকলের চোখে মুখে বিরাট বিস্ময়। উনি বলেন, ভয়ানক একটা শক্ত কাজ না? সকলের মাথা হেঁট হয়ে আসে। ধরণীবাবু ওখানে আর না দাঁড়িয়ে চলে আসেন ঘরের মধ্যে। জয়ন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব দেখছিল। এবার ওর সঙ্গে ঘরে গিয়ে ঢোকে। জয়ন্তর চোখে শুধু বিস্ময় নয়, কিছু যেন শ্রদ্ধাও। জয়ন্তর চোখের ছাপ ধরণীধরের দৃষ্টি এড়ায় না। একটু হেসে বলেন, বড্ড হতাশ হলেন. না জয়ন্তবাবু? ধরণীধর চৌধুরী এমন একটা মুটে-মজুর ক্লাসের লোক ভাবতে পারেন নি, কেমন?

—তা সত্যি পারি নি।—কেমন যেন অভিভূত হয়ে বলে জয়ন্ত, আপনার সম্বন্ধে একেবারে অন্যরকম ধারণা ছিল আমার। খুব স্পষ্ট করেই হেসে ওঠেন ধরণীধর এবার। বলেন, তাই নাকি! আরে সে ত আপনার সম্বন্ধেও আমার ছিল। আপনাকে দেখলে

কে বলবে যে ওই হাতে কলম দিলেই তা থেকে আগুনের ফুলকি ছোটে। আপনাদের নতুন খবরের আমি একজন মস্ত ভক্ত, তা জানেন? জয়ন্ত এবার হাসে না। স্বরটা একটু কঠিন করেই বলে, এত ভক্ত বলেই বুঝি তার গলা টিপে মারবার ব্যবস্থা করেছেন!

—গলা টিপে মারবার ব্যবস্থা! আমি করেছি!

—বাকী কিস্তির দায়ে মেশিন তুলে আনবার হুকুমটার সেই রকম অর্থই হয় না কি?

—ও, মেশিন তুলে আনতে গিয়েছিল বুঝি! অবনীবাবু! অবনীবাবু!

—আজ্ঞে আমায় ডাকছেন—অবনীবাবু এসে ঢোকেন ঘরে।

—হ্যাঁ ডাকছি। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে শিখেছেন কতদিন? জয়ন্ত যেন চমকে ওঠে ধরণীধরের গলা শুনে।

অবনীবাবু বলেন—আজ্ঞে—

আর কিছু বলা হয় না, আগে ধরণীবাবু বলেন, নবজীবন প্রেসের মেশিন তুলে আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন?

—আজ্ঞে তিন তিনটে কিস্তি ওদের বাকী পড়েছে, অফিসের নিয়ম মত—

—নিয়ম! বড় নিয়ম শিখেছেন না! নিয়মের আর নড়চড় হয় না? নতুন খবর কাউকে রেয়াৎ করে কথা বলে না। বড্ড কড়া কড়া ঘা দেয়, তাই নিয়মটা একটু বেশি করে জারি করে আমায় খুশি করবেন ভেবেছিলেন, কেমন?

অবনীবাবু নীরবে দাঁড়িয়ে একবার মাথা চুলকোন, আর একবার হাত কচলান। কিছুই বলতে পারেন না তিনি।

ধরণীধরের স্বর একটু নরম হয়। বলেন—যান, আমায় জিজ্ঞেস না করে কখনও যেন নবজীবন প্রেসে তাগাদা না হয়!

অবনীবাবু তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

ধরণীধর প্রত্যাশী চোখ নিয়ে তাকান একবার জয়ন্তর দিকে।

জয়ন্ত চোখ নামায়, তারপর ধীরে ধীরে বলে, আমি কিন্তু অনুগ্রহ চাইতে আসি নি ধরণীবাবু, এসেছিলাম কিস্তি শোধ দেবার আর একটু সময় চাইতে।

ধরণীবাবু একটু হাসলেন। বলেন, সময় সুযোগ সবই আপনাদের দিলাম, যান, এবার মনের সাধে যত খুশি আমাদের গাল দিন। জয়ন্ত তবু একটু খোঁচা দিয়ে বলে, তা হয়ত দেব! কিন্তু ওই সামান্য কাগজের আলপিনের খোঁচা আপনার গায়ে লাগে কি?

হো-হো করে হেসে ওঠেন ধরণীধর।—চামড়া অনেক মোটা বলছেন! তাহলে আলপিনকে তলোয়ার করে তুললেই ত পারেন! হঠাৎ স্বরটা নামিয়ে তিনি আবার বললেন, শুনুন জয়ন্তবাবু, আসবেন আমাদের এখানে? নেবেন একটা কাগজের ভার?

জয়ন্ত স্পষ্ট জবাব না দিয়ে আর একটা প্রশ্ন করে—আমায় কাগজের ভার দিতে চান, কিন্তু তাতে আপনার লাভ? আপনার সানাইয়ের দলে আমি ত পোঁ ধরতে পারব না।

—পোঁ ধরবার দরকার হলে আপনাকে ডাকতাম না! তার যথেষ্ট লোক আছে।

জয়ন্তর মনে হল ধরণীধরের কথা যেন রীতিমত খোসামোদের মত শোনাচ্ছে—। ধরণীধর বলছিলেন, শুনুন, নতুন একটা খবরের কাগজে সমস্ত ব্যবস্থা ছকা আছে। আপনি সম্পাদক হয়ে সেটা শুরু করুন। শেতলা ঠাকরুণ, সাধারণের ফাইলটা দিয়ে দাও দেখি! শেতলা অর্থাৎ স্টেলা বসে ছিল ঘরের একদিকে। বলে, সাধারণের ফাইল ত আপনার টেবিলের ওপরই আছে। টেবিলের ফাইলগুলো নাড়তে নাড়তে ধরণীধর পেয়ে যান ফাইল—হ্যাঁ এইত! পেয়েছি। —ফাইলটা জয়ন্তর সামনে তুলে ধরে ধরণীধর বলে ওঠেন, যাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ধর্ম, রাজনীতি থেকে দুনিয়ার সব জাল জুয়াচুরির

কারবার চলেছে, সেই সর্বসাধারণের হয়ে লড়বার একটা সত্যিকার কাগজ গড়ে তুলতে পারেন না! বলুন, নেবেন এর ভার? টাকার জন্যে ভাববেন না। সেদিকে কোন অভাব আপনার রাখব না। কথা শুনতে শুনতে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল জয়ন্ত। হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বলে উঠল, ভাবনাটা টাকার জন্যে নয় ধরণীধরবাবু —ভাবনাটা আলাদা। নতুন খবর আমি ছাড়তে পারি না—

—ছাড়তে পারেন না?—এক মিনিট কি চিন্তা করেন ধরণীধর। তারপর আবার বলেন, বেশ। নতুন খবরকেই এই সাধারণের মত বড় দৈনিক করে তুলুন। আপনাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে আমি তার সমস্ত দায় নিতে প্রস্তুত। জয়ন্তর মনটা সাড়া দিয়ে ওঠে। দৈনিক হবে নতুন খবর! এলোমেলো লাগছে যেন। সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। জয়ন্ত ধরণীধরের কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বলে,—সমস্ত দায় নিতে প্রস্তুত?···একটু থেমে আবার বলে, তবু কথাটা আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমাদের ভেবে দেখবার সময় চাই। ধরণীধরের মুখটা হাসিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। বলেন, বেশ, ভেবে দেখেই জবাব দেবেন। আমি অপেক্ষা করে রইলাম।

—আচ্ছা নমস্কার। কোন গতিকে নমস্কারটা সেরে বেরিয়ে যায় জয়ন্ত ঘর থেকে। ঘরের হাওয়া বড় গরম, মনের ভেতরটাকে পর্যন্ত গরম করে দেবে।

জয়ন্ত বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত কুঞ্জ এসে ঢোকে। আড়াল থেকে সব শুনেছে ও। তাই ঘরে ঢুকেই একেবারে চীৎকার করে ওঠে, কুঞ্জর চেহারা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। কথা বলতে ঠোঁট দুটো ওর কাঁপছে!—ওই জয়ন্ত—ওই ভূঁইফোড়টাকে দিয়ে আপনি নতুন কাগজ বার করতে চান? ওর আস্পর্ধার এই হল সাজা!

ধরণীধর আগের মতই হাসেন। বলেন, হ্যাঁ, এই হল সাজা।

গায়ে ফোড়া উঠলে তাকে পাকিয়ে তুলে তবে কাটতে হয়, বুঝেছেন কুঞ্জবাবু।

কুঞ্জ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ধরণীধরের দিকে।

॥ নয় ॥

আকাশের মত হাল্কা মন নিয়ে ফিরল জয়ন্ত প্রেসে। মুখে মুখে শিস্ দিয়ে চলেছে সে। খুব-খুশির লক্ষণ ওটা। এই শিস্ দিতে গিয়েই রাগারাগি হয়েছিল কুঞ্জর সঙ্গে। বারান্দার ধারে স্টোভে চা করছিল প্রণতি। জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণতি জয়ন্তকে খুশি দেখে হেসে বললে, কি খবর! খুব যেন খুশি মনে হচ্ছে। ভারি তন্তরঙ্গ প্রণতির কণ্ঠ। জয়ন্ত কিন্তু জবাব দিল না ওর কথার। পথে কতকগুলো কাগজ কিনেছিল সেগুলো প্রণতির সামনে মেলে ধরে কাগজওয়ালার ভঙ্গীতে হেঁকে চলল—'নতুন খবর' বাবু 'নতুন খবর' চার চার পয়সা। জয়ন্ত কাগজ নিয়ে প্রণতির চারপাশে ঘুরতে থাকে আপনার খেয়ালে।—আঃ ছেলেমানুষী রাখুন···কি হয়েছে কি?

জয়ন্ত তবু হেঁয়ালি করবে—নতুন খবর চার চার পয়সা—একঠো কিনে পড়ে দেখুন—। প্রণতি বিরক্তির ভান করে কপালটা একটু কুঁচকোয়—আমার কিনে পড়বার গরজ নেই, ভারি ত নতুন খবর. তার আবার চার পয়সা দাম।

—আচ্ছা আচ্ছা, পয়সা না থাকে তার বদলী অন্য কিছু ত আছে।

প্রণতি অবাক হয় আরও ওর কথায়।—অন্য কিছু আবার কি? সন্দেহ ঘনায় ওর স্বরে। জয়ন্ত আরও এগিয়ে যায় ওর দিকে। টেবিলে রাখা টোস্টার থেকে উঠিয়ে নেয় টোস্ট। বলে, এই দুপিস বেশ কড়া টোস্ট—আর ছুরি দিয়ে মাখন লাগাতে লাগাতে বলে—তাতে বেশ পুরু করে মাখন—তার ওপর একটু মরিচের গুঁড়ো—বলতে বলতে মরিচের শিশি নিয়ে ঝাড়তে শুরু করে রুটির ওপর—

আর তার সঙ্গে একটু জেলি—জেলির শিশিটা তুলে নিতে যাবে এমন সময় প্রণতি ছিনিয়ে নেয় শিশিটা ওর হাত থেকে—। বলে, কি হচ্ছে কি পাগলামি! ওভাবে বিদঘুটে খাওয়া কেউ খায়?

—খায় না! আলবৎ খায়। হঠাৎ সাপের পাঁচ পা যারা দেখে তারা খায়—রাস্তায় আলাদীনের প্রদীপ—

প্রণতি মাঝপথে থামাতে চায় ওকে—আঃ থামুন ত।—কিন্তু জয়ন্ত থামবে না। সে বলেই চলেছে—রাস্তায় আলাদীনের প্রদীপ যারা কুড়িয়ে পায়, তারা খায়। হঠাৎ লটারিতে যারা লাখটাকা মুফৎসে পেয়ে যায়, তারা খায়—আর খায় যাদের ফ্ল্যাট মেশিনের সাপ্তাহিক হঠাৎ রোটারি মেশিনের দৈনিক হয়ে বেরিয়ে আসে—তারা ওর হেঁয়ালিকে আরও রহস্যময় করে থামে জয়ন্ত আর কামড় দেয় টোস্টে। প্রণতির চোখ মুখ এবার সত্যিই বিস্ময়ে ভরে ওঠে।—তার মানে?

—তার মানে তাই—দৈনিক! জয়ন্ত পরম নিশ্চিন্তে টোস্ট চিবোয়।

—দৈনিক!

—হ্যাঁ দৈনিক নতুন খবর। বাংলা দেশের সব চেয়ে নতুন, সব চেয়ে সেরা খবরের কাগজ, সকালে উঠে যে কাগজ না দেখলে লোকের দিন খারাপ যাবে। হকাররা যে কাগজ নেবার জন্যে মারামারি করবে—যে কাগজ—জয়ন্ত আরও কিছু বলত। কিন্তু তার উচ্ছ্বাসের ফেনাকে প্রণতির কঠিন স্বর যেন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। প্রণতি বলে, নতুন খবর সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হবে, ধরণীবাবুই নিশ্চয় এ পরামর্শ দিলেন। জয়ন্তর উৎসাহ তবু নেভে না যেন। জয়ন্ত বলে, শুধু পরামর্শ নয় প্রণতি, আরও অনেক কিছু তিনি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এখনও তুমি চুপ করে বসে আছ? খুশিতে গান গেয়ে উঠতে তোমার ইচ্ছে করছে না? ইচ্ছে করছে না সব কিছু ছড়িয়ে ছত্রাকার করে দিতে? এতবড় একটা খবর শুনে এই তোমার চেহারা! ছড়াবার কথা বলতে

গিয়ে হাতের কাগজগুলো ছড়িয়ে দেয় জয়ন্ত চারপাশে। নিবারণবাবু আসছিলেন সেই সময়ে; ওঁর গায়ে কাগজ গিয়ে লাগে। আপন মনে আসছিলেন নিবারণবাবু, কাগজটা ভ্রুক্ষেপ করেন না তিনি। জয়ন্তর শেষ কথাটা ওঁর কানে লেগেছিল—'এই তোমার চেহারা!' নিবারণবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠেন, বল ত বাবা, তুমিই বল, চেহারা খারাপ হচ্ছে কি না ওর। পই পই করে আমি বলছি এত খাটিস নি মা, শরীরে সইবে না। প্রেসের কাজ, সংসারের কাজ, এ কি এক সঙ্গে হয়! রান্নাবান্নার জন্যে একটা রাঁধুনী রাখি। তা কিছুতেই শুনবে না, বলে, রাঁধুনীর রান্না খেলে নাকি আমার শরীর খারাপ হয়। আরে আমার দিন ত ঘনিয়ে আসছে। এখন গেলেই হয়। আমার শরীর ভাল রাখতে তোর শরীর যদি খারাপ হয়, তাহলে কি স্বর্গলাভটা আমার হবে! না, এবার আমি আর কোন কথা শুনছি না—

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুযোগ নিয়ে বলে, না, কোন কথা আপনাকে শুনতে হবে না। বসুন আপনি ওইখানে—। নিবারণবাবু একটু যেন অবাক হয়েই বসে পড়েন সামনের চেয়ারটায় আর তাকিয়ে থাকেন জয়ন্তর মুখের দিকে। জয়ন্ত তখন বলছে, আচ্ছা, এইবার রোটারি মেশিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, ঠিক সমুদ্র গর্জনের মত আওয়াজ, আর তার সঙ্গে বাইরে ডেলিভারি-ভ্যান আর সাইকেল-পিয়নদের হট্টগোল—। নিবারণবাবু উত্তরোত্তর বিস্ময়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন। সত্যিই যেন রোটারি মেশিনের আওয়াজ আসছে, অথচ শুনতে পাচ্ছেন না, এমনভাবে বলেন, কই না ত!

—পাচ্ছেন না এখনও?—হেসে ওঠে জয়ন্ত—আচ্ছা কদিন বাদেই পাবেন। ঘণ্টায় হাজার হাজার নতুন খবর যখন প্রতিদিন আপনার প্রেস থেকে বেরুবে, নবজীবন প্রেসের নাম যখন দেশের এক প্রান্ত থেকে—। আর সহ্য করতে পারেন না নিবারণবাবু বিস্ময়ের পীড়ন। বাধা দিয়ে বলেন, তুমি কি বলছ জয়ন্ত, আমি যে

কিছুতেই বুঝতে পারছি না! জয়ন্ত এতক্ষণে তার উচ্ছ্বাস আর হেঁয়ালী থামিয়ে স্পষ্ট করে বলতে শুরু করে। শুনুন তাহলে, শোন প্রণতি—ছোটেলাল ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছিল, তাকেও শোনায় জয়ন্ত—শোন ছোটেলাল, আমি ধরণীবাবুর কাছ থেকে আসছি। নতুন খবর আর সাপ্তাহিক নয়, এখন থেকে দৈনিক হয়ে বেরুবে। সমস্ত Plan Complete. নিবারণবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, নতুন খবর দৈনিক হবে—সে ত অনেক টাকার ব্যাপার!

—টাকার কথা আপনি ভাবছেন কেন? টাকার জন্যে ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে বলে জয়ন্ত। প্রণতি কথা বলে এতক্ষণে। তার স্বর আগের মতই কঠিন আর ধারালো। তার জন্যে ধরণীবাবু আছেন, না?

—নিশ্চয়। তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন জোর দিয়ে বলে জয়ন্ত।

বিস্ময় আর উত্তেজনায় অধীর হয়ে নিবারণবাবু বলেন, আমাদের সঙ্গে ধরণাবাবু যোগ দেবেন! কিন্তু কেন?

জবাব দেয় ছোটেলাল।—কেন সামঝাতে পারছেন না! জোর —ওই আপনাদের বাঘ, বাঘ যে জন্যে বকরীর সাথে দোস্তি করে। ছোটেলালের কথার মধ্যে খোঁচাটুকু আর লুকিয়ে থাকে না।

জয়ন্ত বলে, না না। তুমি ভুল করছ। বাঘ-ছাগলের সম্পর্ক এটা নয়।

—কিন্তু সম্পর্কটা তাহলে কিসের? প্রণতির কঠিন স্বর উঁচু পর্দায় গিয়ে ওঠে—কি জন্যে ধরণীবাবু হঠাৎ এত উদার হয়ে উঠছেন, সেইটেই যে বুঝতে পারছি না!

—অকারণে মানুষকে অত ছোট করে না ভাবলে হয়ত বুঝতে পারতে প্রণতি। কেমন যেন আহত স্বরে বলতে থাকে জয়ন্ত—নতুন খবর ধরণাবাবুর ভাল লেগেছে, আমাদের ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে। এও তাঁর উদারতার কারণ ত হতে পারে।

—আমাদের ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে বুঝলাম, কিন্তু তাঁর ওপর আমাদের বিশ্বাস ত না থাকতে পারে।

—না থাকবার কারণ ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তাঁকে অনেক ভাবে ঘা দিয়েছি। কিন্তু তিনি আমাদের কোন ক্ষতি ত এখনও করেন নি।

প্রণতি চুপ করে যায়। মনে মনে ও যেন ভেঙ্গে পড়ছে। সেই জয়ন্ত একদিনে এমন হয়ে গেল! ধরণীধরের স্বর্ণজালে পথ ভুলল? প্রণতিকে চুপ করে থাকতে দেখে ছোটেলাল বলে উঠল, দেখো জয়ন্ত ভেইয়া, আমার এক বাৎ শুনো। ধরণীবাবুর মতলব খুব ভাল আছে জানলাম। কিন্তু সে হল সোনে কি গাগরি। আমাদের মাট্টিকে গাগরির সাথে তাঁর মহব্বৎ হোলে আমাদেরই মুশকিল।

জয়ন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলে, এসব কোন কাজের কথা নয় ছোটেলাল। আমাদের কাগজ বড় হয়ে উঠুক তাও কি তোমরা চাও না?

প্রণতি আবার কথা বলে—নিজের জোরে যদি বড় হতে না পারি তাহলে অন্যের ফুঁয়ে বেলুনের মত ফেঁপে উঠে কোন লাভ নেই।

—শুধু নিজের জোরে নতুন খবর কতদিনে দৈনিক হয়ে উঠতে পারবে তুমি আশা কর?

—হয়ত কোনদিনই হবে না। তবু দৈনিক হবার জন্যে ধরণীবাবুর মত লোকের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেওয়ায় আমি সায় দিতে পারব না।

—আপনারও কি তাই মত নিবারণবাবু? পরাজিতের মত প্রশ্ন করল জয়ন্ত।

—আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না জয়ন্ত। আমার একটু ভাবতে সময় দরকার। নিরুৎসাহ হয়ে বলেন নিবারণবাবু।

—থাক, আপনাদের আর ভাবতে হবে না। বিকিয়ে যদি দিতেই হয় আমি নিজেকেই দেব। আপনাদের সে পাপের ভাগী

করব না। হতাশায় আর বিমর্ষতায় ডুবে গিয়ে আচ্ছন্নের মত বলে জয়ন্ত। আর কথা শেষ করেই ওদের সামনে থেকে চলে যায় বাইরে। ছোটেলাল জয়ন্তর পিছন পিছন বেরিয়ে যায়।

প্রণতি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু জয়ন্তর যাওয়ার দিকে। ওর চোখ শুকনো, অসাধারণ রকমের শুকনো।

জয়ন্ত সোজা এসে অফিস-ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। মাথার ভেতরটা যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। ঘরের হাওয়াটা যেন বিষে ভর্তি। কোথাও এতটুকু নিশ্বাস নেবার ফাঁক নেই। ছোটেলাল পিছন থেকে এসে একটা হাত রাখে ওর পিঠে। বলে, সচমুচ্ গোস্‌সা হয়ে গেলে জয়ন্ত ভাইয়া?

জয়ন্ত প্রথমটা চুপ করে থাকে। তারপর শুকনো গলায় বলে, রাগ করা আমার অন্যায় হয়েছে ছোটেলাল। তার জন্যে মাপ চাইছি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি যে, এখানে তোমাদের সঙ্গে থাকা আমার আর চলবে না।

—কেয়া বলতে হো ভেইয়া? এহি ত গোস্‌সা কি বাত হ্যায়। আমাদের তুমি ছেড়ে চলে যাবে!

—রাস্তা যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে বুক ভেঙ্গে গেলেও ছেড়ে যেতেই যে হবে ছোটেলাল!

নিঃশব্দে প্রণতি এসে ঘরে ঢোকে। কথাগুলো ওর কানে ঢুকেছে। নিজের থেকেই জবাব দেয় প্রণতি—এতদিন রাস্তা ত আলাদা ছিল না, হঠাৎ আজই ধরণীবাবুর কল্যাণে সেটা আলাদা বলে আবিস্কার করলেন বুঝি?

প্রণতির গলা শুনে একটু যেন চমকে, একটু যেন বিহ্বল হয়ে তাকায় জয়ন্ত। তারপর বলে, সত্যিই তাই করলাম প্রণতি, আর আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা। আমার সঙ্গে তোমাদের মতে মিলবে না। জ্বালাতে যদি হয় তবে আমি মশালই জ্বালাতে চাই। মিটমিটে বাতি নয়। যদি সত্যি আমার

কিছু জানাবার থাকে, লক্ষ লক্ষ লোককে তা আমি জানাতে চাই, সামান্য দুচার জনকে নয়।

—কতজনে জানল শুধু তার সংখ্যা দিয়েই কি সত্যের দাম যাচাই হয়? প্রণতির কথার জ্বালা যেন কমে আসছে। জয়ন্ত বলে, সত্যের নিজস্ব দাম যাই হোক, অন্ধ গুহায় সত্য বন্দী থাকলে কি তার সার্থকতা? ধরণীবাবু তোমাদের চোখে যত মন্দই হোক, আমি জানি তার হাতে সেই দরজার চাবি, বাইরের বড় জগতে যেতে হলে যে দরজা আমাদের পার হতেই হবে!

প্রণতি আরও এগিয়ে আসে জয়ন্তর দিকে। বলে, ওই একটা ছাড়া বড় জগতে বার হবার আর কি দরজা নেই? জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। ওর স্বরের বিষণ্ণতার মেঘ যেন কেটে যাচ্ছে। নিজেকে আরও বেশি প্রকাশ করতে চাইছে ও।—থাকবে না কেন? হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু সামনে দরজা পেয়েও ছেড়ে দিয়ে হাতড়ে বেড়াবার কোন মানে আমি পাই না।

—ভেইয়া, সামনে দরওয়াজা ত ঠিক আছে, লেকিন কেইসে মালুম তা দিয়ে রাস্তা মিলবে, না গাঢ়ামে গির পড়বে। ছোটেলাল বিচক্ষণের মত ঘাড় নাড়ে আর বলে।

—তাছাড়া চাবি যার হাতে, দরজা সে ত অমনি খুলে দেবে না। কি দাম সে আদায় করে নেবে সেটা হিসেবের মধ্যে ধরেছেন?

—অত হিসেব-নিকেশের আর কোন দরকারই ত নেই প্রণতি! নতুন খবরকে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক করবার কথা ভাবাই আমার অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করছি। নতুন খবর যে আমার নিজের কাগজ নয়, এটা মনে রাখা উচিত ছিল।

চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে প্রণতি! আঘাতটা সহ্য করতে একটু সময় লাগে। ছোটেলাল একবার তাকায় প্রণতির দিকে, তারপর একটু চেঁচিয়ে বলে, কেয়া বোল রহ জয়ন্ত, কেয়া তুমারা দিমাক বিগড় গিয়া, কেয়া! ছোটেলালের কথার জবাব দেয়

প্রণতি। সমস্ত দুর্বলতাকে জয় করে সে যেন জেগে উঠেছে এবার। জয়ন্ত শেষ আঘাত দিয়েই বুঝি জাগাল ওকে। প্রণতি বলে, না ছোটেলাল উনি ঠিকই বলেছেন। নতুন খবর ওঁর নিজের কাগজ নয়, এটা বুঝতে যে ওঁর এত দেরী হয়েছে, এইটেই আশ্চর্য্য। কথাটা শেষ করে কিন্তু আর দাঁড়াতে পারল না প্রণতি; গলাটাও কি কাঁপল একটু? কাঁপল চোখের পাতা? ফিরে দাঁড়াল ও দরজার দিকে যাবে বলে। বাধা পড়ল দরজায়।—আসতে পারি কি? গলা শোনা গেল কুঞ্জর।

অনুমতি না পেয়েই ঘরে ঢুকল কুঞ্জ। ওর ভাবভঙ্গীতে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ যেন উঁকি দিচ্ছে। হেসে ঘাড় নাচিয়ে বলল, আরে খাওয়া দাওয়া, উৎসব, হৈ-হুল্লোড় কিছু ত দেখছি নে। জ[illegible]বাবুর কেরামতিতে সাপ্তাহিক কাগজ দৈনিক হয়ে উঠছে খবর পেলাম। কিন্তু কই? কিছু না হোক, এ অভাগার বরাতে কি একটা চাকরিও জুটবে না। না কি ইতিমধ্যেই নো ভেকেন্সি? জয়ন্ত হাসল একটু। বোধ হয় ওর হাসিও ব্যঙ্গের। বললে, না, আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন কুঞ্জবাবু। আপনার উপযুক্ত জায়গা আপনার জন্যেই খালি করে রেখে গেলাম। বেরিয়ে গেল জয়ন্ত ঘর ছেড়ে। বাকী তিনজন ঘরের মধ্যে এক মহাশূন্যতাকে চোখ মেলে দেখতে লাগল শুধু।

আরও কিছু বক্তব্য ছিল জয়ন্তর। নবজীবন প্রেসে নয়, ধরণীধরের অফিসে। তাই সেখানেই গেল জয়ন্ত। ভেবে দেখবার সময় নিয়েছিল ধরণীধরের কাছে, তার ফলাফল জানিয়ে দিতে গেল ও। আশা দিয়ে এসেছিল জয়ন্ত, কিন্তু এবার গিয়ে নিরাশ করল। সোজা জানিয়ে দিল, তার পক্ষে ধরণীধরের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক ভেবে দেখেছে সে।—হয়ত রাজী হত সে শেষকালে। কিন্তু হঠাৎ কেন তার সিদ্ধান্ত বদলে গেছে। হঠাৎ মেঘ হালকা আকাশকে করে তুলেছে ভারি! ধরণীধরের মত লোকও কম অবাক

হন নি। তবে কি তাঁর চালের ভুল হয়ে গেল? ধরণীধর বললেন, আপনার কাছে এ-জবাব আমি সত্যিই আশা করি নি জয়ন্তবাবু! নতুন খবর আমাদের সঙ্গে আসতে রাজী না হোক, আপনি ত আসতে পারেন! সেখানে কোন দাসখৎ আপনার ত লেখা নেই?

—দাসখৎ ছাড়া আর কিছুতে কি মানুষ বাঁধা থাকে না? না ধরণীবাবু, নতুন খবর আমাকে ছাড়লেও আমি তাদের ছাড়তে পারি নি।

— আপনার কলমে আগুন ছিল বলেই এত করে ডাকছি। সমস্ত মাঠ যে আলো করে দিতে পারে সে মশাল বন্ধ ঘরে জ্বালিয়ে লাভ কি? আপনার নতুন খবরের লেখা ক'জনের কাছে পৌঁছয়?

উঠে দাঁড়ায় জয়ন্ত। বলে, তা হয়ত পৌঁছয় না। তবে মাঠ আলো করার সৌভাগ্য ত সকলের হয় না! এ যেন জয়ন্তর কণ্ঠস্বর নয়। আর একজনে যেন বলে দিচ্ছে। ধরণীধর শেষ চেষ্টা করে দেখেন। বলেন, তবু আমার দরজা আপনার জন্যে খোলা রইল জয়ন্তবাবু। কখনো যদি মত বদলান, তাহলে সাধারণ কাগজ আপনার জন্যে তোলা আছে জানবেন। পাতলা হাসি ফুটে ওঠে জয়ন্তর মুখে। মৃদু মাথা দোলায় ও। তারপর নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে—ধীরে।

এবারেও আসতে ভুল করে নি কুঞ্জ। জয়ন্তর পিছন পিছন হাজির হয়েছে ধরণীধরের অফিসে। জয়ন্ত বেরিয়ে যেতে কুঞ্জ এসে ঢোকে ঘরে। মুখে তার অস্ফুট হাসি। সে হাসি শুধু ব্যঙ্গের নয়, গর্বেরও। বাইরে থেকেই বলতে বলতে আসছিল কুঞ্জ—রাজী হল না ত স্যর! হবে কোথা থেকে? সে মুরোদ ওর আছে! নবজীবন প্রেসের ঐ ডোবাটুকুর মধ্যেই ফড়্ ফড়্ করে, দৈনিক কাগজের সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মরবে। আপনার কোন ভাবনা নেই স্যর। সাধারণ কাগজ আমি কি করে তুলি দেখবেন। ভারটা শুধু আমার ওপর ছেড়ে দিন।

—আপনার ওপর ছেড়ে দেব? পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন ধরণীধর—কেন, আমি কি এখানে পিঁজরাপোল বানিয়েছি?

—পিঁজরাপোল!

—হ্যাঁ, যত কানা খোঁড়া অথর্বদের পোষবার পিঁজরাপোল ত এটা নয়!

—আজ্ঞে আমি কানা খোঁড়া অথর্ব! আমার লেখা ত আপনি পড়েছেন। আজ পনেরো বছর ধরে সম্পাদকী করছি! অসহায়ের মত বলতে থাকে কুঞ্জ।

—তবু এখনও পিঁজরাপোলে যান নি। সময় ত হয়ে গেছে।

না, আর সহ্য করা যায় না। রসিকতারও একটা সীমা ত আছে। কুঞ্জ এবার গলা চড়িয়ে দেয়—কি বলছেন স্যর? আপনার ভরসাতেই নতুন খবরের কাজ ছাড়লুম—

—এখানের আশাটাও সেই সঙ্গে ছাড়ুন। যান সময় নষ্ট করবেন না—

আজকে যেন বিস্ময়ের আর সীমা নেই। কুঞ্জ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাববার শক্তিও যেন তার লোপ পাচ্ছে। জয়ন্ত তখনও বেরিয়ে যায় নি অফিস থেকে। সিঁড়ির নীচে আটকেছেন সবিতা দেবী। জয়ন্ত নেমে আসতেই এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন সবিতা দেবী—মাপ করবেন, আপনিই জয়ন্তবাবু, না? নতুন খবরের ভূতপূর্ব সম্পাদক?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

—আপনাকে একটু অভিনন্দন জানাতে পারি কি?

—কেন?

—এই আমাদের খাতায় নাম লেখাবার জন্যে। ছিলেন বুনো পাখী, কেউ খোঁজও রাখত না। এখন দাঁড়ে বসে মজুদ ছোলা খাবেন আর শিস্ দেবেন। দেশশুদ্ধ ধন্য ধন্য করবে। সাধারণ কাগজ ত এখন আপনারই হাতে।

ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে জবাব দিয়েছে জয়ন্ত। হাসি মুখেই বলেছে,—অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার অভিনন্দনটা বৃথাই নষ্ট হল। আপনাদের দাঁড়টা খালিই রেখে যাচ্ছি! কথা শেষ করে উত্তর পাবার সুযোগ নেয় নি জয়ন্ত। চলে গেছে অফিস থেকে।

প্রেসে কাজ নেই। মনও নেই। তাই এই বাড়িজোড়া ফাঁকটাকে এড়াবার জন্য প্রণতি খুশির কাছে এল। খুশি একাই বসে আছে। জয়ন্ত নেই। প্রণতি গল্প ফাঁদল খুশির কাছে। ছোট-খাটো কথা থেকে মনের কথা! প্রাণ-খোলা হাসি। জয়ন্ত বাড়ি ফিরেছিল এর মধ্যে, কিন্তু প্রণতিকে খুশির সঙ্গে কথা কইতে দেখে ফিরে গেছে, ঘরে ঢোকে নি। প্রণতির কাছে তার আসল পরিচয় দিতে সে রাজী নয়। রাজী হয় নি গোড়ায়, এখনও নয়। দাদার গল্প খুশি খুব করে প্রণতির কাছে। কিন্তু দাদাকে দেখাতে পারে না এই তার দুঃখ। প্রণতিও দুঃখিত। অদ্ভুত মানুষ বটে, সারাদিন একবারও দেখা পাবার যো নেই।—সত্যি, তোমাব দাদা কি রকম লোক বল ত! এত বড় বাড়িতে তোমায় একলা রেখে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়?

—দাদার যে অনেক কাজ—বড় গলায় বলে খুশি।

—ছাই কাজ! কি কাজ করে তুমি জান?

খুশি এবার একটু বিচলিত হয়। সত্যি, সে জানে না তাব দাদার কি এত কাজ। খুশি বলে, আমি কি করে জানব! আমায় ত বলে না।

প্রণতি দুষ্টুমি করে হেসে বলে, সত্যি তোমার দাদা আছে কি না তাই আমার সন্দেহ হয়, জান? নইলে এতদিন আসছি একদিন চেহারাটাও দেখতে পেলাম না!

খুশিও হাসে। ওর চোখেও কিসের যেন আলো। খুশি বলে, সত্যি কথা বলব?—দাদা যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না?

—তাই নাকি? তা ত জানতাম না।—একটু বিচলিত হয়ে প্রণতি বলে, তোমার দাদা খুব লাজুক বুঝি?

—তা জানি না। তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না।

তাহলে আমায় ভয় করে বোধ হয়। হাসতে হাসতে বলে প্রণতি।—তোমার দাদাকে বলো যে আমায় দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। আচ্ছা এখন আসি, কেমন? প্রণতি নেমে এসে সিঁড়ি পেরিয়ে যেতেই জয়ন্ত বেরিয়ে এসে ডাকে। প্রণতি! একটু দাঁড়াও!

জয়ন্তর গলা শুনে চমকে দাঁড়ায় প্রণতি।—আপনি এখানে?

—হ্যাঁ এইটেই আমার বাড়ি। আমিই খুশির দাদা। এতদিনের রহস্য বিনা ভূমিকাতেই প্রকাশ করে দেয় জয়ন্ত।

—আপনিই খুশির দাদা? এই বাড়ি আপনার? প্রণতির মুখ নিমেষে কালো হয়ে আসে।

—তোমাকে বলব ভেবেও এ কথাটা বলতে পারি নি। তাতে অবশ্য এখন বোধ হয় কিছু যায় আসে না।

—না জয়ন্তবাবু, তাতে অনেক কিছু আসে যায়। বড়লোক হয়েও শখ করে কম্পোজিটরী করা আপনার কাছে অবশ্য বাহাদুরি কিন্তু আপনাকে আমাদেরই মত সাধারণ লোক ভেবে নিজে করতে যাওয়া আমাদের মস্ত অপরাধ! আগে জানলে বোধ হয় অপরাধটা করতাম না।

একটি তারা থেকে আর একটি তারায় ছুটে যাওয়া উল্কার মত কথাগুলো লাগল জয়ন্তর গায়ে। প্রণতি ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। জয়ন্ত ডাকল, শোন প্রণতি, আমায় ভুল বুঝো না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে যে!

তারায় আলো দেয়। কিন্তু তাই বলে তার দেওয়া উল্কা শুভকর নয়।

এক মিনিটের জন্য ঘুরে দাঁড়ায় প্রণতি। বলে, না, কোন কথা আর নেই। আমাদের সঙ্গে দুদিনের পরিহাস করবার আপনার শখ হয়েছিল—সে শখ আপনার মিটে গেছে। আমাদের মত ন

লোকদের সঙ্গে চিরদিন আপনি নিজেকে জড়িয়ে রাখবেন একথা ভাবাই আমাদের ধৃষ্টতা। কথা শেষ করেই চলে গেল প্রণতি।

জয়ন্ত ডাকল, শোন প্রণতি, যেও না, শোন!

আজ প্রণতির চলে যাওয়ার পালা। জয়ন্ত নিস্পন্দ হয়ে দেখল। এর আগে অনেকগুলো কথা বলে জয়ন্ত বেরিয়ে এসেছিল প্রণতির বাড়ি থেকে। নিজের ঠোঁটটা অজ্ঞাতেই কামড়ে ধরল জয়ন্ত।

॥ দশ ॥

শেষ পর্যন্ত মত বদলায় জয়ন্ত আর একবার। ভেবে দেখেছে সে গভীরভাবে। কী সম্পর্ক তার নতুন খবরের সঙ্গে? প্রণতি নিজের মুখে বলেছে, আমাদের মত নগণ্য লোকেদের সঙ্গে চিরদিন আপনি নিজেকে জড়িয়ে রাখবেন, একথা ভাবাই আমাদের ধৃষ্টতা! জয়ন্ত প্রণতির কথাগুলো বারবার আবৃত্তি করে। আর কি বলেছিল যেন সে? আমাদের সঙ্গে দুদিন পরিহাস করবার আপনার শখ হয়েছিল—সে শখ আপনার মিটে গেছে! চমৎকার! শখ হয়েছিল পরিহাস করবার! মাথাটা কেমন করে ওঠে জয়ন্তর। হ্যাঁ শখ আছে তার পরিহাস করবার; পরিহাসই করবে। কী সম্পর্ক তার নতুন খবরের সঙ্গে! দৈনিকের সম্পাদক করে দিচ্ছে ধরণীধর তাকে। ...কী আশ্চর্য লোক ঐ ধরণীধর। ওরই নামে যত মিথ্যে বদনাম শুনেছিল জয়ন্ত। না, আর একবার ভেবে দেখতে হবে। ধরণীবাবু কথা দিয়েছেন সবরকম স্বাধীনতা তিনি দেবেন....তবে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে জয়ন্ত। খোলা জানলা দিয়ে রাতের কালো আকাশ থেকে যেন রোটারি মেশিনের ঘট-ঘট শব্দ অজস্র ঢেউয়ের মত গ্রাস করে ওকে...আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্বপ্ন দেখে জয়ন্ত। তার বহু জাগ্রত স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি....!

ধরণীধর মিথ্যা বলেন নি। সব ব্যবস্থাই তাঁর করা ছিল। কেবল মাত্র জয়ন্তর সম্মতির অপেক্ষায়। জয়ন্ত কথা দিয়েছে। ধরণীধরের উৎসাহের তাই অন্ত নেই। অল্পদিনের মধ্যেই বেরিয়ে গেল 'সাধারণ।' কাগজওয়ালারা হেঁকে চলল, আনন্দবাজার, বসুমতী, স্বরাজ, সাধারণ—নতুন বেরুল বাবু—সাধারণ, সাধারণ! অনেকেই একখানা করে সাধারণ কিনে নিয়ে যায়। নতুন কাগজে কি লেখা হল তাই দেখবার জন্য। সম্পাদকের নামটাও লোকে উৎসাহের সঙ্গে দেখে—জয়ন্ত চৌধুরীর নাম ছড়িয়ে পড়ে অতি সহজেই।

একখানা 'সাধারণ' হাতে নিয়ে কুঞ্জর হোটেলের মালিক কুঞ্জকে গিয়ে আক্রমণ করেন—বলি ও মশাই, জোচ্চুরির আর জায়গা পান নি? ডাহা তিনটে মাস স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে আমায় ঠকিয়ে এলেন? কুঞ্জ বেরোবে বলে তৈরী হচ্ছিল, মালিকের এই হঠাৎ আক্রমণে একটু যেন বিব্রত বোধ করে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে, আমায় বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ আপনাকে। তিন তিনটি মাস হোটেলে ত একটি পয়সা ঠেকান নি, চাইতে গেলে লম্বা চওড়া সব কথা শুনিয়েছেন।··· এখন—এখন কি হল এটা? মালিক 'সাধারণ' কাগজটা মেলে ধরেন কুঞ্জর সামনে। কাগজের ওপরেই বড় বড় করে সম্পাদকের নাম লেখা—জয়ন্ত চৌধুরী। কিছু অন্যায় বলেন নি মালিক। ধরণীধরের উস্কানিতে নতুন খবর ছাড়বার পর থেকেই সাধারণের সম্পাদক হবার স্বপ্ন দেখছে কুঞ্জ। সেই আশায় কিছু খরচা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে—দেনা হয়ে গেছে বাজারে—বাকী পড়ে গেছে মেসের টাকা; অথচ সেই ধরণীধর কি না শেষে—। কুঞ্জ হতাশায় আর রাগে যেন কাঁপতে থাকে। কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে এখুনি। না হলে মালিকের কাছে রেহাই পাওয়া দায়। ঘরের আর দু'জন

রুম-মেটও অবজ্ঞার হাসি নিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।···কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বলে, কি হল এটা? অত ভড়কাচ্ছেন কেন? কি হয়েছে কি?

—কি হয়েছে জানেন না? এই ত আপনার 'সাধারণ' কাগজ বেরিয়েছে। কোথায়—কোথায় আপনার নাম?

—আমার নাম? আমার নাম কাগজে থাকবে কেন? আমি কি চুরি ডাকাতি করেছি, না মিনিস্টার হয়েছি?

—ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজবেন না মশাই। আপনি না সাধারণের সম্পাদক হচ্ছেন? হাজার টাকা মাইনে পেয়ে আমাদের সব রাজা করে দিচ্ছেন! এই ত সম্পাদকের নাম জয়ন্ত চৌধুরী। বলুন ওটা ছাপার ভুল!

এক মুহূর্ত আত্মরক্ষা করবার উপায় চিন্তা করে নেয় কুঞ্জ। তারপর মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বলে, ছাপার ভুল হবে কেন? ওই চোথা কাগজের কাজ আমি refuse করেছি।

—Refuse করেছেন!—মুখভঙ্গী করে বলেন মালিক—অথচ ঐ হাজার টাকার ভাঁওতা দিয়ে তিন তিনটি মাস দিব্যি ত হোটেলে জামাই-আদরে কাটিয়ে দিলেন। আর আমি কিছু শুনছি না। হয় হোটেলের পাওনা দিন, নয় তল্পি-তল্পা নিয়ে এখুনি পথ দেখুন।

—পথ দেখব কেন?—নরম সুরে বলতে থাকে কুঞ্জ—দেব দেব আপনার সব পাওনা চুকিয়ে দেব! আমার কি কাজের ভাবনা! এই ত Statesman থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। ফিরে এসেই সব পাওনা মিটিয়ে দেব। পাশের সীটে রুম-মেট বিপিনবাবু শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিলেন। আবহাওয়াটাকে হালকা করবার জন্য কুঞ্জ অন্তরঙ্গের মত বলে বিপিনবাবুকে—দেখি হে বিপিন একটা সিগারেট!—হাত বাড়িয়ে দেয় কুঞ্জ বিপিনবাবুর প্যাকেটটার দিকে। এতটুকু আগ্রহ দেখা যায় না বিপিনবাবুর। নিশ্চিন্তে একটা টান দিয়ে বলেন, ওই দূর থেকেই দেখো দাদা, না হয় নিজের পকেট

থেকেই বার করে একটা দেখাও। আমাদের চক্ষু সার্থক হোক! কান দুটো লাল হয়ে ওঠে কুঞ্জর। পকেট থেকে দেখাতে পারলে কি আর মুখ ফুটে চাইতে হয় ওকে? কুঞ্জ চেঁচিয়ে, বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বলে, আচ্ছা ছোটলোক ত! একটা সিগারেট ধার দিতে পার না?

—সাধে ছোটলোক হয়েছি দাদা!—মালিকের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বলেন বিপিনবাবু—গোটা ভার্জিনিয়াটা ধার দিয়েও যে তোমার কাছে কূল পাওয়া যায় না!

—ছ্যাঃ, এ হোটেল আমি ছেড়েই দেব। কালই দেব! মেজাজের সঙ্গে কথাগুলো বলে দুম দুম করে বেরিয়ে যায় কুঞ্জ ঘর থেকে। যেতে যেতে শোনে মালিক বলছেন—তাই দয়া করে দিন, আমাদের হাড়ে বাতাস লাগুক। পথে বেরিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় কুঞ্জ। মনে মনে যা-খুশি গাল দিতে থাকে ধরণীধরকে। কিন্তু গাল দিলেই ত শুধু চলবে না। অনেকগুলো টাকা দেনা হয়ে গেছে···কোথায় পাওয়া যাবে টাকা? মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করতে থাকে। এখন অন্ততঃ একটা সিগারেট না হলে চলে না। কিন্তু পকেট শূন্য, একটা সিগারেট কেনবার মত পয়সাও নেই আর! হোটেলের নীচে পানের দোকানটায় গিয়ে দাঁড়াল কুঞ্জ। পানওলা লোক ভাল, মুখের কথায় বিশ্বাস করে ধারে জিনিষ দেয়! ওর পাওনাও নেহাৎ কম হয় নি। তা হোক, এক প্যাকেট সিগারেট না হলে চলবে না। মুখের সব ঝড়ের চিহ্ন মুছে দিয়ে স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে কুঞ্জ বলে, ওহে দেখি এক প্যাকেট সিগারেট! পানওলা জবাব দেয় না। পাশের আর এক ভদ্রলোককে পান দিতে থাকে।

—কই দেখি জলদি! দেরী হয়ে যাচ্ছে!

—দেরী হয়ে যাচ্ছে ত করব কি! হাত ত আমার দু'খানা বই চারখানা নয়! এই নিন সিগারেট!

প্যাকেটটা নিয়ে কুঞ্জ এগোচ্ছিল। পানওলা চেঁচিয়ে ওঠে. কই দামটা ?

—দাম দেব'খন হে দেব'খন পরে।

—ওসব দেব-টেব অনেক শুনেছি। দাম এখনি দিয়ে যান, নইলে দিন সিগারেট ফেরৎ। কুঞ্জ রাগ দেখায়।—সিগারেট ফেরৎ দেব মানে ? আমি কি দাম না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি নাকি ? দাম পাবে পরে। কুঞ্জ এগিয়ে যায় আরও। হঠাৎ পানওলা লাফিয়ে নামে রাস্তার ওপর, আর কুঞ্জর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় প্যাকেটটা। বলে, তাহলে সিগারেটও পরে পাবেন ! একটু হতভম্ব হয়ে পড়ে কুঞ্জ। সকাল থেকে কি এক কুগ্রহের দৃষ্টি লেগেছে। পানওলা শুদ্ধ অপমান করতে চায় ওকে ! ধরণীধর থেকে পানওলা পর্যন্ত। আহত হয়ে কুঞ্জ চীৎকার করে ওঠে—কী এতবড় তোমার আস্পর্ধা, আমার হাত থেকে সিগারেট তুমি ছিনিয়ে নাও ! জানো, একটা কলমের খোঁচায় তোমার মত ফুটপাতের দোকানীকে আমি দেশছাড়া করতে পারি ? জানো কার সঙ্গে তুমি—

এতটুকুও ভড়কায় না পানওলা। কুঞ্জর মুখের ওপরই বলে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব পারেন আজ ছ'মাস ধরে আপনার অনেক বড় বড় বুলি শুনেছি। শুধু পয়সার আওয়াজটাই পাই নি। ওদের ঘিরে বেশ কয়জন লোক জড় হয়ে গেছে ততক্ষণে। তাদের দিকে তাকিয়ে পানওলা শোনাতে থাকে—আজ ছ'মাস ধরে মশাই ধার শোধ দেবার নাম নেই, শুধু ধাপ্পা দিয়ে চালাচ্ছেন, তার ওপর আবার চোখ রাঙানি—ভীড়ের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে আসে। সে জয়ন্ত। পথ চলতে চলতে গোলমাল শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিশেষ যখন হাঙ্গামাটা নিয়ে। জয়ন্ত পানওলাকে বলে, এঁর কাছে তোমার কত পাওনা হয়েছে ?

—পঁচিশ টাকা মশাই, পঁচিশ টাকা—শ্রোতা পেয়ে পানওলা

উত্তেজিত হয়ে চেঁচায়—আজ দেব, কাল দেব, করে ছ'টি মাস আমায় ফাঁকি দিয়েছেন!

জয়ন্ত জবাব দেয় না। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে পঁচিশ টাকা গুণে দেয় পানওলার হাতে!—এই নাও তোমার পঁচিশ টাকা, সন্তুষ্ট হয়েছ? বিস্মিত দৃষ্টিতে টাকাগুলো গুণতে গুণতে পানওলা হেসে হেসে বলে, ন্যায্য টাকা পেলে আর সন্তুষ্ট হব না কেন! ভীড় পাতলা হয়ে যাচ্ছে। জয়ন্ত বেরিয়ে আসে ভীড় থেকে। পিছনে আসে কুঞ্জ। কুঞ্জ বলে, তুমি—মানে আপনি কেন দিতে গেলেন জয়ন্তবাবু? একটি পয়সা ওকে না দিয়ে এমন শিক্ষা দিতাম! চাপা হাসি নিয়ে জয়ন্ত বলে, সেটা শিক্ষার বাজে খরচ হত না কি? তার চেয়ে পয়সা দেওয়া অনেক সোজা। শুনুন, আপনি কি এ পাড়ায় থাকেন?

—তা না হলে কি বে-পাড়া থেকে এখানে সিগারেট খেতে আসি মশাই?

—আপনার কি কাজকর্ম এখন নেই?

—নেই মানে? হাত মুখ নেড়ে বলে কুঞ্জ—সাধাসাধি ঝুলো-ঝুলি বড় বড় সব কাগজ থেকে। পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে—এখনো ঠিক করি নি কোথায় যাব!

—কারা আপনাকে সাধছে? এখনও চাপা হাসি জয়ন্তর ঠোঁটে অম্লান।

—এই যুগান্তর, বসুমতী, আনন্দবাজার—যেখানেই যাব লুফে নেবে। কাঁধ দুটোয় ঝাঁকানি দিয়ে সাহেবী কায়দা করে কুঞ্জ। জয়ন্ত বলে, না, তা নেবে না। একটিবার সত্যি কথাটা স্বীকার করুন না। জয়ন্ত কথা শেষ করে তাকায় কুঞ্জর দিকে। কুঞ্জ তাকাতে পারে না ওর দিকে। তবু বলে, তার মানে? আপনি বলতে চান কি? আমার হয়ে পঁচিশ টাকা দেনা শোধ দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন ভাবছেন? কাজ পেলেই দিয়ে দেব আপনার পঁচিশ টাকা। কুঞ্জ

চলে যাচ্ছিল। জয়ন্তর কথা শুনে দাঁড়ায়। জয়ন্ত বলে, তা দেবেন জানি। কিন্তু তার আগে কাজ ত পাওয়া দরকার। করবেন কাজ?

—কোথায়? মাথা নীচু করে বলে কুঞ্জ।

—যদি বলি 'সাধারণ' কাগজে।

—'সাধারণ' কাগজে? সে ত ধরণীধর চৌধুরীর—তার সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না মশাই। রেগে ওঠে কুঞ্জ।

—তা না হোক। আমি আপনাকে নিচ্ছি। জয়ন্ত পিঠে হাত রাখে কুঞ্জর।

—আপনি আমায় নিচ্ছেন! কেন বলুন ত?

জয়ন্ত এবার জোর দিয়েই হাসে। বলে, সত্যিই অ্যাটম বোমা আপনার কলমে এখনও লুকোন আছে এই আশায়। আসুন, আজ থেকেই আপনার কাজ শুরু। ঘেমে ওঠে কুঞ্জ। সকাল থেকে একটা কুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল। এখন যেন মনে হচ্ছে গ্রহটা একেবারে অশুভ নয়। সম্মতি বা আপত্তি কোনটাই না জানিয়ে কুঞ্জ চুপ হয়ে যায়।

ইলেক্‌শনের দিন এগিয়ে আসছে। যোগজীবনের অস্বস্তির আর শেষ নেই। ধরণীধরের উৎসাহে এতবড় একটা কাজে হাত দিয়েছেন যোগজীবন। অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে। ঘোরাঘুরি ছুটোছুটির কোন অন্ত নেই। এতটুকু যার আওয়াজ সেই নতুন খবরকেও সামলাতে হচ্ছে! সামলাতে হচ্ছে আরও অনেক দিক! ধরণীধর আশ্বাস দিয়েছেন নতুন খবরের বিষদাঁত ভাঙবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। টাকার লোভে, নামের আশায় বিকিয়ে দিয়েছে জয়ন্ত চৌধুরী নিজেকে। 'সাধারণ' কাগজ উল্কার মত আবির্ভূত হয়েছে সংবাদপত্র জগতে। জয়ন্ত নিজেকে বিকিয়েছে বটে কিন্তু কলম তার ভোঁতা হয় নি একটুও। কাগজ পড়লে তার আসল বক্তব্যটি

যে কি তা জানতে অসুবিধে হয় না একটুও। যোগজীবন 'সাধারণ' কাগজ নিয়ে ধরণীধরের অফিসে এসে হাজির হন। ধরণীধরের টেবিলের ওপর কাগজটা ফেলে ধরে বলেন, খুব ঘটা করে ত নতুন পুষ্যি নিয়েছিলে! হাসি দেখে আরও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন যোগজীবন—দেখেও নির্বিকার হয়ে বসে আছ? তোমার কি বল না, আমায় সামনে ঠেলে দিয়ে পেছনে বসে মজা দেখছ! যত কাদা মাটি চূন কালি আমার গায়েই লাগুক। তুমি ত তাই চাও!

—চূন কালির এই ভয়টা কবে থেকে হয়েছে বলত যোগজীবন! যেদিন থেকে ট্যাঁকটা বেশি রকম ভারি হয়েছে! চূণকালি আমাদের কিছু কম ছিল কোনকালে? কোনদিন তার ভয়ে কোন কাজে পেছপাও হয়েছি?—চোখ আর কপাল কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন ধরণীধর! এ কুঞ্চনের একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে! যোগজীবন অনেকটা সুস্থ বোধ করেন যেন। বলেন, কিন্তু তাই বলে সেধে অপমান ডেকে আনতে হবে! কি দরকার ছিল আমার ইলেক্‌শনে দাঁড়াবার!

—দরকার আরও ক্ষমতা নেবার জন্যে—টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বলেন ধরণীধর—সমস্ত কলকাঠি হাতে পাবার জন্যে। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ত আমরা নই। দু'চারটে গালাগালি শুনে মুষড়ে পড়বার মত মেনিমুখোও নই!

—তাই বলে নিজেদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের কাছে মার খেতে হবে? কি জন্যে এই 'সাধারণ' কাগজটা তুমি এই জয়ন্তর ওপর ছেড়ে দিয়েছ? 'সাধারণ' কাগজের ব্যাপারটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেন না যোগজীবন। ধরণীধর একটু উপমা দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেন যোগজীবনের কাছে। সোজা কথার চেয়ে এই ঘোরালো কথার জোর বেশি। ধরণীধর বলেন, যে জন্য বঁড়শিতে টোপ দিয়ে লোক ছিপের সুতো ছেড়ে দেয়। একেবারে গেঁথে তুলে আনবে বলে। একটু ধৈর্য ধর যোগজীবন—একটু খেলাতে দাও।

আরও অনেকটা সুস্থবোধ করেন যোগজীবন। ধরণীধরের গভীর চালের খানিকটা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে এতক্ষণে! কিন্তু এখনও অস্থিরতা রয়েছে যোগজীবনের। বলেন, আচ্ছা জয়ন্তকে না হয় ঢোপ দিয়ে খেলাচ্ছ, কিন্তু 'নতুন খবর' এর ওই একটা চুনো-পুঁটিকেও ত সায়েস্তা করতে পারলে না এতদিনে। কি বিষটা আমাদের বিরুদ্ধে ছড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছ? ওকেও কি খেলিয়ে তুলতে হবে?

কালো হাসি হাসে ধরণীধর, বলেন, না, ওর জন্যে সোজা দাওয়াই আছে। ওর বিষ মেরে দেবার ব্যাবস্থা এখনি করছি!—টেবিল থেকে রিসিভারটা তুলে নেন উনি।—হ্যালো বড়বাজার—নাইন সিক্স··· হ্যালো কে? অরুণ কোম্পানী? কে রামপদ? বলি তোমাদের ওটা কি? কাগজের আড়ৎ না দানছত্র! নবজীবন প্রেসে নতুন খবরের জন্যে কবে কাগজের ডেলিভারি নিয়েছে? নিতে আসবে আজ! বেশ, ওই সমস্ত কাগজ আমার জন্যে মজুদ করা থাকবে।···একটি চিরকুটও ওরা যেন না পায়। —না বাকী টাকা চুকিয়ে দিলেও নয়—। আচ্ছা মনে থাকে যেন। আচ্ছা!—রিসিভার নামিয়ে রেখে ধরণীধর তাকিয়ে দেখেন যোগজীবনের দিকে অর্থপূর্ণভাবে। যোগজীবন বলেন, শুধু ঐটুকুতেই কাজ হবে? এই তোমার সোজা দাওয়াই! আবার হাসতে থাকেন ধরণীধর। বলেন, না ওটা শুধু দাওয়াইএর ঝুটো লেবেল···আসল দাওয়াইএর ফলাফল পরে টের পাবে। ধরণীধরের জবাব শুনে যোগজীবনের মুখেও এতক্ষণে অস্পষ্ট হাসির রেখা দেখা যায়। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন না আর যোগজীবন। আজ রাত্তিরে পার্টি দিচ্ছেন তিনি। সকাল থেকে তিনি বিশেষ ব্যস্ত। তাই উঠতে হয় ওঁকে। ধরণাধরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর বিশ্বাসে মনটা তাঁর ছেয়ে গেছে ততক্ষণ!

অন্ততঃ দশ রীম কাগজ চাই আজকে। তা না হলে এবারের

সংখ্যা নতুন খবর আর বার হবে না, জরুরী দরকার। অথচ কাগজের দোকানে অনেকগুলো টাকা দেনা পড়ে আছে। নিজে না গেলে হয়ত কাগজ দেবেনা ওরা। কাজেই, নিবারণবাবু নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন কাগজের জন্য। চীনা বাজারের ভীড় ঠেলে পৌঁছতে একটু দেরীই হয়ে গেল। বিকেল হয়ে আসছে। দোকান বন্ধ হয়ে আসবার সময় হয়ে এল। অরুণ কোম্পানীর কর্মচারীরা তৈরি হচ্ছে বাড়ি যাবার জন্যে। নিবারণবাবু রোজের মতই এসে কাগজ চেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কথা বলছে না। আগ্রহ দেখাচ্ছে না। খানিক পরে জবাব এল, কাগজ নেই মশাই, হবে না!

—কাগজ নেই? অবাক হয়ে যান নিবারণবাবু। এখানকার বাজারে কাগজ নেই? বহু কাগজ ত চালান এসেছে এ মাসে। বেশি করে এসেছে অরুণ কোম্পানী যে মিলের এজেন্ট সেই মিল থেকে। বিশ্বাস হয় না। এড়িয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। বন্ধ করবার মুখে আর খাটতে চাইছে না কেউ। এমন হয়েই থাকে। কিন্তু কাগজ যে চাই, নিবারণবাবুর। ফর্মা আটকে আছে প্রেসে। নিবারণবাবু আর একবার অনুরোধ করেন—দেখুন না মশাই!

—কেন মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছেন! কাগজ নেই ত আপনাকে দেব কি?

—আমাদের এই সামান্য সাপ্তাহিক ছাপবার মত দশ রীম কাগজ আপনাদের আড়তে নেই? এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

—বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে। কাগজ আমরা দিতে পারব না এর পর আর কথা চলে না। তবু বলতে হয় নিবারণ-বাবুকে—নগদ দাম দিলেও না!—খেঁকিয়ে ওঠে দোকানদার।—না না না। ভারি নগদ দাম দেখাচ্ছেন, আগে যা বাকি পড়ে আছে তা শোধ করুন দেখি!

মিথ্যে বলে নি দোকানদার! সেইটেই গোড়া থেকে সন্দেহ

করে নিজে এসেছিলেন নিবারণবাবু। জয়ন্তর লেখা পড়ে যে ভাবে কাগজ চলেছিল সেই আশায় অনেকখানি কাগজ কিনে ফেলেছিলেন উনি। কিন্তু দামটা দেওয়া হয় নি। আজকের কাগজটা পাওয়া গেলে, কিছু বিক্রী হত এ সপ্তাহে, তাতে কাগজের সব দামটা উঠে আসত। সেই আশাতেই এসেছিলেন নিবারণবাবু নিজে। তাই শেষ বারের মত চেষ্টা করেন নিবারণবাবু—বলেন, যেমন করে পারি তা শোধ করে দিচ্ছি। শুধু অন্ততঃ পাঁচ রীম কাগজ আমাকে দিন—নইলে নতুন খবর এবারে আর বার হবে না!

—তাহলে ত গোকুল আঁধার হয়ে যাবে! কত বড় বড় কাগজ উঠে গেল আর ভারি ত আপনার একটা ছেঁড়া সাপ্তাহিক! ক'জন পড়ে ও কাগজ! অপমানের একটা সীমা আছে। নিবারণবাবুর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। একটু কড়া হয়েই বলেন তিনি,—ক'জন পড়ে তাই দিয়ে ত কাগজের বিচার হয় না। বিচার হয় কি পড়ে তাই দিয়ে। দোকানদার এবার চোখ রাঙায়—কেন মিছে বাজে বকছেন মশাই। কাগজ নেই, আপনাকে দিতে পারব না। ব্যস, অত তত্ত্বকথার কি ধার ধারি। আর কোন কথা বলেন না নিবারণ-বাবু। বেরিয়ে আসেন দোকান থেকে। দোকান থেকে বেরিয়ে দেখেন সামনে একজন লোক। লোকটি বলে, নমস্কার নিবারণবাবু।—আপনি কাগজের খোঁজে এসেছিলেন? উৎসাহিত হয়ে ওঠেন নিবারণবাবু।—হ্যাঁ। কাগজ কি তাহলে পাওয়া যাবে? নতুন খবর বেরোবে ঠিক মত?

—কাগজের ব্যবস্থা এখুনি হয়ে যাবে। একটু যদি এদিকে আসেন।

বিহ্বল হয়ে এগিয়ে চলেন নিবারণবাবু ওর সঙ্গে। কাগজ তাঁকে পেতেই হবে। যে করে হোক। পথের পাশে একখানা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকটি বলে, নিন, উঠুন এই গাড়িতে!

—তার মানে? মৃদু আপত্তি জানাতে চান নিবারণবাবু।

—উঠুন না! পরে বুঝতে পারবেন!

যন্ত্রের মত গাড়িতে প্রবেশ করেন নিবারণবাবু। গাড়ি চলতে থাকে।

অনেক রকম যন্ত্র আছে ধরণীধরের। অনেক কৌশল। ঝুটো লেবেল দেখে গিয়েছিলেন যোগজীবন। এবার দাওয়াই দেখছেন নিবারণবাবু নিজে! এই দাওয়াই রোগ-সারায় না, একেবারেই সরিয়ে দেয়।

॥ এগারো ॥

যোগজীবনের পার্টি জমে উঠেছে বেশ। বিরাট হলে জমা হয়েছে ভোটাররা। গণ্যমান্য অতিথিরা আর যত কাগজের সম্পাদক। কাগজেব সম্পাদকদের ইচ্ছে করেই নিমন্ত্রণ করেছেন যোগজীবন। কিছু মিষ্টিমুখ করিয়ে কলমটাকে মিষ্টি করতে চান ওদের। শহরের গণ্যমান্যেরা এসেছেন যোগজীবন সমাদ্দারকে চিনে রাখবার জন্যে। যে লোক জলের মত টাকা ঢেলে চলেছে সে লোকের নাম অতি সহজেই পৌঁচেছে এঁদের কানে। তাই নিমন্ত্রণ পাবার পর অবহেলা করতে পারেন নি এঁরা। যোগজীবনের খুশির আর অন্ত নেই!—কেনই বা থাকবে? আয়োজনের কোন ত্রুটি যখন হয় নি। নাচ, গান, জলযোগ। বসন্ত-লাগা বনের মত আলো আর রঙের মেলা বসেছে যেন। জয়ন্তও এসেছে এর মধ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে। জয়ন্তকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করছেন যোগ-জীবন, করছেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ধরণীধর নিজে। জয়ন্তর মুখ কিন্তু বিষণ্ণ, দৃষ্টি নিষ্প্রভ, শরীর নিস্তেজ। কোথায় যেন ত্রুটি, কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক—চারিদিকে চেয়ে চেয়ে শূন্য চোখে জয়ন্ত যেন তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরণীধর বলেন, কি জয়ন্তবাবু, একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছেন?

—তা একটু করছি। স্বীকার করছে জয়ন্ত ভূমিকা না করে। আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করবার কি প্রয়োজন ছিল বুঝতে পারছি না!

—বাঃ! ইলেক্‌শনের জন্যে পার্টি; আর আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে না! জবাব দিয়েছে যোগজীবন। জয়ন্ত মুখর হয়ে উঠেছে। শাণিত শব্দ প্রয়োগ করছে ধীরে ধীরে। বাঁকা হাসি মিশিয়ে দিয়ে বলে—ও, ইলেক্‌শনের জন্যে পার্টি! ঐ নাচটাও তাহলে ইলেক্‌শন ক্যামপেনের একটা অঙ্গ? নাচ দেখিয়েও ভোট পাওয়া যায়!

বিব্রত বোধ করছেন যোগজীবন, ধরণীধরও। রাগ হবারই কথা। কিন্তু রাগলে চলবে কেন? রাগের প্রতি বিরাগ দেখাবার সময় এখন! ভালবাসার মত রাজনীতিতেও ছলাকলাটাই বড়। মার্জিত হাসি দিয়ে উপভোগ করতে ইচ্ছে জয়ন্তর কথাগুলো। ওদের কথার মধ্যে হঠাৎ একজন বেয়ারা এসে খবর দেয় জয়ন্তকে ফোনে কে ডাকছে।

—আমার ফোন? এখানে? জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে ওঠে। সামান্য একটু সময়ের মধ্যে এখানে ফোন করবে কে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কোন্ হাসপাতাল থেকে ডাকছে—বললে জয়ন্ত-বাবুকে চাই।

ধরণীধর যোগজীবনের দিকে তাকান গভীর দৃষ্টি নিয়ে। জয়ন্ত তাকায় ওদের দুজনের দিকে, বেয়ারার দিকে। অবাক হয়ে বলে, হাসপাতাল থেকে? আচ্ছা, চল যাচ্ছি। শুধু বিস্ময় নয় আশঙ্কা ঘনায় জয়ন্তর মনে, চোখে। হাসপাতাল কেন? অ্যাকসিডেন্ট? অসুখ? কোথায়? নিজের মনে প্রশ্নের ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটে জয়ন্ত।

—হ্যালো! হ্যাঁ আমি জয়ন্তবাবু, বলুন—অ্যাকসিডেন্ট! সিরিয়াস! পরিচয় পাওয়া যায় নি! অজ্ঞান অবস্থায় আমার নাম করছে! কিন্তু, কিন্তু আমি ত এরকম কারুর কথা মনে করতে পারছি না!...

কি বললেন? আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে একবার গেলে হয়ত ভাল হয়! আচ্ছা যাচ্ছি! বিমূঢ়ের মত ফোনটা নামিয়ে রাখে জয়ন্ত। কে এমন লোক! যে শুধু জয়ন্তর নাম করে?....তখনই বেরিয়ে পড়ল জয়ন্ত হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

হাসপাতালের রাত্রি। কালো কালো অন্ধকার আর নিঃশব্দে ডুবে আছে সব। সাদা-পর্দা আর সাদা-কাচ লাগানো বাড়িগুলো মৃত্যুর মত পাণ্ডুর! ঘরে ঘরে মৃদু-আলোর ঝিমুনি! অন্ধকার-ভরা মন নিয়ে হাজির হল জয়ন্ত এমারজেন্সি ওয়ার্ডে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। ডাক্তারবাবু বললেন, বিকেলের দিকে এক ভদ্রলোককে আহত অবস্থায় মানিকতলার খাল পেরিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে রাস্তার ধারে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। স্বাস্থ্যবান, তবে কিছু যেন দুর্বল। শোনা গেছে, কোন চলন্ত গাড়ি থেকে কারা যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ভদ্রলোককে। শিউরে ওঠে জয়ন্ত। চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে? গাড়ির নম্বর নিয়েছে কেউ? না, গাড়ির নম্বর নিতে পারে নি কেউ। খুব জোরে চলছিল গাড়ি, ততোধিক জোরে পালিয়েছে।...সাংঘাতিক জখম হয়েছেন ভদ্রলোক। একরকম অজ্ঞান হয়েই পড়ে আছেন, তবে মাঝে মাঝে কাগজপত্রের কথা বলছেন—

কাগজের কথা বলছেন! আরও অবাক হয় জয়ন্ত? সন্দেহ ঘনায়।

—হ্যাঁ, আর মাঝে মাঝে নাম করছেন জয়ন্ত!...পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। তবে সাধারণ কাগজের নাম করছেন মাঝে মাঝে। আপনি বোধ হয় চিনতে পারেন! সেই জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিলাম—

—না, এতে আর কষ্ট কি! কই কোথায়?

লম্বা বারান্দার ডান দিকে বাঁকের মাথায় যে ঘর, সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন ডাক্তারবাবু।—এই যে জয়ন্তবাবু।

—এ কি, এ যে নিবারণবাবু! জয়ন্তর গা যেন ঝিম ঝিম করতে

থাকে। সারা গায়ে-মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছেন নিবারণ-বাবু। চোখ বন্ধ। মাঝে মাঝে কপালটা কুঁচকে উঠছে! বিড় বিড় করে বলছেন, হার মানব না, কিছুতেই হার মানব না। জয়ন্তকে ডেকে পাঠাও প্রণতি, জয়ন্তকে·····

রঙ আর আলোর মেলা থেকে সুতীব্র সুচিতার মাঝে এসে জয়ন্তর পা টলে, মাথা ঘোরে! কোথা থেকে কোথায় এল সে? কিন্তু···নিবারণবাবুর এমন দশা হল কেন? কে ফেলে দিল গাড়ি থেকে? কারা? কেন? হঠাৎ চাবুকের মত একটা সমাধান ওর মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল যেন। নিবারণবাবু জয়ন্তর নাম উচ্চারণ করছেন শুধু—জয়ন্ত, জয়ন্তকে ডেকে পাঠা—

—এই যে আমি জয়ন্ত। জয়ন্ত এগিয়ে যায় নিবারণবাবুর মুখের কাছে। প্রকাশ করতে চায় ওর উপস্থিতি।

—না, না, কাগজ আমি ছাড়ব না....কাগজ আমি ছাড়ব না.... জয়ন্তকে বারণ করে দে প্রণতি, ওদের কাছে কলম যেন না বেচে দেয়—নিবারণবাবু ঘোলাটে দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে তাকান জয়ন্তর মুখের দিকে।····

ডাক্তারবাবু বলেন, আপনি তাহলে চেনেন?

—হ্যাঁ চিনি, ভাল করেই চিনি। সত্যি করে বলুন ডাক্তারবাবু কেসটা কি খুব সিরিয়াস? কোন আশা নেই? উদভ্রান্ত হয়ে আসে জয়ন্তর দৃষ্টি। এলোমেলো ওর চুল। ঠোঁট যেন কাঁপছে বলতে গিয়ে—! ডাক্তারবাবু শান্ত করেন ওকে।—আমরা ডাক্তার. জয়ন্তবাবু। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আশা আছে মনে করে চেষ্টা করাই আমাদের ধর্ম। এইটুকু আমি আশা দিতে পারি যে, আজ রাত্রের মধ্যে জ্ঞান হলে হয়ত এ যাত্রা রক্ষা পেতেও পারেন। এঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ—

—হ্যাঁ, আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি।

জয়ন্তর ফোন পেয়ে ছোটেলালকে সঙ্গে করে প্রণতি আসে। নিবারণবাবুর কাছে এসে আর্তনাদ করে ওঠে প্রণতি—বাবা! নিবারণবাবু আগের মত ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকান—আর বলেন—না না ছাড়ব না....কাগজ আমরা ছাড়ব না!...শুকনো মাটির দেশের মানুষ ছোটেলালের চোখে বুঝি জল!...এ কাজ কে করিয়েছে জয়ন্ত ভেইয়া একবার হামায় বোলে দাও—

জয়ন্ত মাথা নীচু করে বসে আছে একপাশে। মাথা না তুলেই বলে, এ কাজ যারা করেছে তারা ত ভাড়াটে গুণ্ডা মাত্র, ছোটেলাল। কিন্তু এর পেছনে যারা আছে তাদের মুখোশ খুলে সত্যকার চেহারা সকলকে চিনিয়ে দিতেই আমি যাচ্ছি। কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়ায় জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে। তার চোখের দিকে তখন বুঝি তাকান যায় না—। প্রণতি বলে—তুমি—আপনি এখন যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আমায় এখনিই যেতে হবে প্রণতি। আমার যা করবার আছে তা এখানে নয়—সাধারণ অফিসে!—দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার থামে জয়ন্ত—। বলে, জ্ঞান হলে তোমার বাবাকে কালকের 'সাধারণ' একবার পড়ে শুনিও প্রণতি। জয়ন্ত যে কলম বেচে দেয় নি এটুকুও অন্ততঃ তিনি জেনে শান্তি পাবেন। কথা শেষ করেই চলে যায় জয়ন্ত। প্রথম যেদিন জয়ন্ত এসেছিল সেদিন যে চোখ দেখেছিল তার, প্রণতি আজ যেন আবার সেই চোখ দেখল জয়ন্তর। সেদিন কোন কথা বলে নি। আজও আর বলতে পারল না। স্তব্ধ ঘরে, অনেক কথার চেয়ে এই নীরবতার দাম বুঝি খুব বেশি।

হাসপাতাল থেকে ছুটে এল জয়ন্ত সাধারণ কাগজের অফিসে। স্তব্ধতা আর গাম্ভীর্যের আবহাওয়া থেকে এল শব্দ আর বিশৃঙ্খলার রাজত্বে। শ্রান্তির ক্ষেত্র থেকে ক্লান্তিকর পরিবেশের মধ্যে। দ্রুত-গতিতে ছাপার কাজ চলেছে। রোটারি মেশিনের একঘেয়ে ঘর্ষণ-শব্দ। কুঞ্জর নাইট ডিউটি চলছে। একটা মেক-আপ প্রুফের ওপর মাথা ডুবিয়ে বসে আছে আর দাগ মেরে চলেছে একমনে। এমন

সময় জয়ন্ত তার বিস্রস্ত চুল, বিশৃঙ্খল দেহ নিয়ে এসে ঢুকল। সামনের চেয়ারটায় দিল গা এলিয়ে।—কি ব্যাপার? এত রাত্রে ফিরে এলেন যে? পার্টিতে যান নি?—একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে থামে কুঞ্জ। ভাল করে চেয়ে দেখে ক্লান্তিতে ম্লান জয়ন্তর চেহারার দিকে। জয়ন্ত বলে, গেছলাম শুধু পার্টিতে নয়, আরও অনেক জায়গায়। টেবিলের ওপর কলিং বেলটায় একটা চাঁটি বসিয়ে দেয় জয়ন্ত। বেয়ারা আসে একজন ডাক পেয়ে।—হেড প্রিণ্টার অনাদিবাবুকে ডেকে দাও—। বেয়ারা চলে যায় অনাদি-বাবুকে ডাকতে। জয়ন্ত কাগজ কলম নিয়ে বসে। লিখবে নাকি ও নতুন কিছু! কুঞ্জর সেই রকমই মনে হয়।—কি হল? নতুন কোন খবর আছে নাকি? প্রশ্ন করে ও।

—হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় জয়ন্ত। তারপর চুপ করে থাকে। অনাদিবাবু আসেন ঘরের মধ্যে।—আমায় ডাকছেন?

—হ্যাঁ। এডিটোরিয়াল পেজ মেক-আপ হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ত মেশিনে চড়িয়ে এলাম।

—এখুনি গিয়ে মেশিন থেকে নামান। তিনজন কম্পোজিটর রেডি রাখুন; যা দিয়েছিলাম তার বদলে নতুন সম্পাদকীয় যাবে আজ।

—নতুন সম্পাদকীয়! হতভম্ব হয়ে যান অনাদিবাবু! জয়ন্ত কোন জবাব দেয় না। কলম নিয়ে বসে গেছে সে ততক্ষণ। কুঞ্জই কথা বলে।—যা বলা হচ্ছে তাই করুন না গিয়ে! আপনার অত ভাববার ত কিছু নেই! অনাদিবাবু নীরবে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। কুঞ্জ এবার প্রশ্ন করে জয়ন্তকে—কিছু ত বুঝতে পারছি না জয়ন্ত-বাবু। এখন আবার নতুন সম্পাদকীয় লিখবেন? আজকের লেখা ত বেশ ভালই হয়েছিল! জয়ন্ত যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে, শুধু সাবধানী কলমের ভালো লেখায় আর চলবে না কুঞ্জবাবু, তলোয়ারের ফলা দিয়ে এবার লিখতে হবে। শয়তানদের সমস্ত

মুখোশ কেটে কুটি কুটি করে তাদের সত্যিকার স্বরূপ যাতে ধরা পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাঁ করে চেয়ে থাকে কুঞ্জ জয়ন্তর দিকে। জয়ন্ত কি আবার বদলে যাচ্ছে! চোখের সামনে সাদা কাগজের ওপর জয়ন্তর লেখা ফুটে উঠেছে—মোটা করে লিখেছে সম্পাদকীয়ের শিরোনামা—'শয়তানের মুখোশ'। অনেকদিন পর আবার মন্ত্র প্রয়োগ করেছে জয়ন্ত—যে মন্ত্রে কালো কালো কতকগুলো আঁচড় আগুনের লাল নিয়ে জ্বলে!....সেনাপতির মত শব্দের সৈনিকদের এগিয়ে নিয়ে চলে সে। আর কুঞ্জ স্তব্ধ হয়ে দেখে।

এক ঘণ্টা পর লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় জয়ন্ত। কুঞ্জ বলে, হয়ে গেল!

—হ্যাঁ। আমি এবার একটু গড়াতে যাচ্ছি কুঞ্জবাবু। আপনি রইলেন। একটু নিজে দেখে দেবেন। ঠিকমত যাতে বেরোয়—

কুঞ্জ লেখাটা নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করেছে ততক্ষণে। খানিকটা দেখেই কুঞ্জ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—এ ত অ্যাটম বোমা—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার ছায়া পড়ে ওর মুখে, বলে—কিন্তু লাইবেলও যে—। যোগজীবন-ধরণীধর কোম্পানী ত ক্ষেপে যাবে। জয়ন্ত কুঞ্জর দুর্বলতা দেখে হাসে। বলে, বিষ দাঁত ভাঙতে গেলে সাপও ক্ষেপে যায়, কিন্তু তাতে ভয় করলে চলে না। আচ্ছা চলি। অভিভূতের মত তখন শুধু পড়ে চলেছে কুঞ্জ। কথা বলবার ফুরসৎ নেই। শুধু ঘাড় নেড়ে সাড়া দেয় জয়ন্তকে। তন্ময় হয়ে পড়ছিল কুঞ্জ, কার পায়ের আওয়াজে মাথা তুলে তাকায়। তাকিয়েই চমকে গেল কুঞ্জ। ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, ধরণীধর নিজে—দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ, ভঙ্গীতে ক্রুর!

—এ কি আপনি এখানে? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে কুঞ্জ।

—এত রাত্রে জয়ন্তবাবু আবার কেন এসেছিলেন ?—ধরণীধরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর অথচ সংযত।

—সে ত তাঁকেই জিজ্ঞেস করতে পারতেন। এইমাত্র ত গেলেন উনি। আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি ?

—আমি দেখা দিই নি। কিন্তু জয়ন্তবাবু কেন এসেছিলেন ?

—নেহাৎই জানতে চান ? এসেছিলেন নতুন সম্পাদকীয় লেখবাব জন্যে—কুঞ্জ জয়ন্তর লেখাটাব দিকে ইঙ্গিত করে।

—দেখি !

—কাল সকালে কাগজেই পড়ে দেখবেন। আশা করি খুশিই হবেন।

—না। ও লেখা কাল বেরুবে না।

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে কুঞ্জ। বলে, কেন ? কাগজের মালিকের হুকুম বলে ? আপনি কাগজের মালিক হতে পারেন, কিন্তু এখানে আপনি কেউ নয়। এখানে সম্পাদকের ছাড়া কারো হুকুম আমরা মানি না। শুনুন, এই লেখাই কাল কাগজে বেরুবে। হেসে বললেও কুঞ্জর স্বর সংযত অথচ গম্ভীর। দপ কবে জ্বলে ওঠে ওঁর চোখ। ফুলে ওঠে কপালের শিরা। গর্জে ওঠে কণ্ঠ—না বেরুবে না। অনাদিবাবু এসে ঢোকে কপি নেবার জন্যে ঠিক এই মুহূর্তে। কুঞ্জ বলে—এই নিন। ধরণীধর বাধা দিয়ে বলেন, দাঁড়ান, আপনি একটু বাইরে যান! অনাদি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ধরণীধর আবার শুরু করেন—আমি হুকুম করতে আসি নি কুঞ্জবাবু—পকেট থেকে নোটের ব্যাগটা বের করে একখানা একশো টাকার নোট হাতের মুঠোয় চটকাতে চটকাতে বলেন—আমি শুধু অনুরোধ করতে এসেছি যে আজকের সম্পাদকীয় আপনি নতুন করে লিখুন। মাথা নীচু করে কুঞ্জ—দেখে—টেবিলের ওপর করকরে একখানা একশো টাকার নোট রাজার মুকুটের চেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে। ফর ফর করছে একটা কোণ টেবিল-ফ্যানের হাওয়া লেগে।

—না, না, আমার দ্বারা তা হবে না। আপনি ভুল করছেন—

—ভুল আমি করি নি কুঞ্জবাবু, আপনি একটু চেষ্টা করলেই পারবেন—এমন লেখা চাই যোগজীবনের জয়ধ্বজার মত যা তার শত্রুদের লজ্জা দেবে—

কুঞ্জর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে আর একখানা করকরে কাগজ—সেখানে স্পষ্ট করে লেখা ওয়ান হাণ্ড্রেড—

—না না আমি পারব না···এ আমি পারব না—আর্তনাদ করে ওঠে কুঞ্জর স্বর—কিন্তু শেষবারের মতই!

—পারবেন, পারবেন, একটু চেষ্টা করলেই পারবেন—আর একখণ্ড কাগজ এসে পড়ে টেবিলের ওপর! কুঞ্জর স্নায়ুগুলো এক অব্যক্ত শব্দে যেন ঝনঝন করে ওঠে।

অনেক রাত্রি জেগে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে, অকাতরে ঘুমিয়ে ছিল কুঞ্জ। জয়ন্ত এসে ঘুম ভাঙালো। বেলা হয়েছে খুব। পথে পথে কাগজওয়ালারা হেঁকে চলেছে—। বেরিয়েছে 'সাধারণ'। কুঞ্জর বিক্রীত কলমের বিকৃত সম্পাদকীয় নিয়ে! রাতে ভাল ঘুম হয় নি জয়ন্তর। মাথার মধ্যে বহু ভাবনার ভীর। উত্তেজনার কোলাহল। প্রত্যাশার অস্থিরতা! শয়তানের মুখোশ খোলার যে মন্ত্র দিয়েছে সে কাল রাতে, সেই মন্ত্রবলের পরিণাম-দর্শনের ব্যাকুলতা নিয়ে সে গুণছে প্রহর। সকালে কাগজ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল জয়ন্ত। কোথায় তার সেই মন্ত্রবলের নৈপুণ্য! শয়তানের মুখোশ উন্মোচিত না হয়ে আর এক মুখোশ-খোলার স্পষ্ট ইঙ্গিত কালো হয়ে আছে সম্পাদকীয় স্তম্ভে। কে লিখল? কুঞ্জ? কেন? 'সাধারণ' খানা হাতে নিয়ে জয়ন্ত এসে হাজির হল কুঞ্জর হোটেলে। ঘুম থেকে জাগাল ওকে। ঘুম ভেঙ্গেই থতমত খেয়ে গেল কুঞ্জ। বেলা হয়ে গেছে বেশ। রোদ্দুর প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে। রোদ্দুর লাগছে জয়ন্তর পকেটে আটকানো কলমটার সোনার ক্লিপে। ঝকঝক করে জ্বলছে ক্লিপটা তলোয়ারের মত। কুঞ্জর সেই দিকে চোখ

পড়তে কুঞ্জ আর একবার চমকালো।—এ কি করেছেন কুঞ্জবাবু। কিসের জন্যে এ সর্বনাশ আপনি করলেন ?

—না না আমি জানি·না····আমি কিছু জানি না....। কুঞ্জ বলে কাঁপা গলায়।

—আপনি জানেন না ত জানে কে ? আপনি তখন কেন দয়া করে একবার বলেন নি কুঞ্জবাবু···তাহলে এ সর্বনাশ আমি হতে দিতাম না।···

—এ লেখা কি করে বার হল আমি জানি না—এ লেখা আমি লিখি নি···সত্যি আমি লিখি নি—

—লেখেন নি ?—কুঞ্জর হাতদুটো চেপে ধরল জয়ন্ত দুই হাতে শক্ত করে—দুটো আগুনের মত দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ওর চোখের দিকে। বললে, এখনও মিথ্যে কথা বলতে আপনার মুখে বাধছে না কুঞ্জবাবু····? সমস্ত শত্রুতা ভুলে গিয়ে আপনাকে আমি আমার কাজের সঙ্গী করেছিলাম। তা না হলে কোথায় ভেসে যেতেন আপনি! কি অবস্থা হত আপনার ?····তার কি এই প্রতিফল ? তার কি এই প্রত্যুত্তর ?···কিসের প্রলোভনে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করলেন আপনি ? বলুন কত টাকা তারা দিয়েছে ? কুঞ্জর মাথা নীচু হয়ে এল। জয়ন্তর কলম থেকে ঠিকরনো আলো খোঁচার মত বিঁধছে, মাথা উঁচু করে তাকালো। ওর মুঠোর মধ্যেই কুঞ্জর হাত বুঝি কেঁপে উঠল একবার!···স্নায়ুগুলো গতরাত্রের মত আবার ঝন্ ঝন্ করে উঠছে!—তিনশ টাকা জয়ন্তবাবু, তিনশ টাকা আমার মত গরীব সাংবাদিকের কাছে সে প্রায় রাজার ঐশ্বর্য। এক সঙ্গে এত টাকার লোভ আমি সামলাতে পারি নি।—প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে কুঞ্জর কণ্ঠ।

—সাংবাদিকের আত্মসম্মান, আপনার নিজের মনুষ্যত্ব—তার দাম মাত্র তিনশ টাকা!

—আমায় ক্ষমা করুন জয়ন্তবাবু, আমায় ক্ষমা করুন। আপনি

যা বলবেন তাই আমি করতে প্রস্তুত! একটু চিন্তা করে দেখে জয়ন্ত। তারপর বলে, প্রস্তুত! বেশ এক্ষুনি আমার সঙ্গে সাধারণ অফিসে চলুন। যে কলম দিয়ে আপনি এতবড় অপরাধ করেছেন তাই দিয়ে আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! উঠে পড়ে কুঞ্জ বিছানা ছেড়ে। রাত্রির অবসাদ এখনও যেন কাটে নি। এখনি যেন সে ভেঙে পড়বে। নীরবে ওরা বেরিয়ে এল পথে।

সাধারণ অফিসের লোহার ফটক বন্ধ। দারোয়ান বসে আছে তার সামনে। ওরা এসে ঢুকতে যাবে এমন সময় দারোয়ান বাধা দেয়—মাপ কিজিয়ে হুজুর, যানে কো হুকুম নেই! কুঞ্জ আগে ঢুকছিল! ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, কি বলছ সিংজী? হুকুম নেই কি? এডিটর সাব যাচ্ছেন—

—হাঁ হাঁ, ও ত জানতে হ্যায়। আপকো ত মানা নেহি, লেকিন এডিটর সাবকো ছোড়নেকো হুকুম নেহি।

—কার হুকুম নেহি? কে হুকুম দিয়েছে? প্রশ্ন করে জয়ন্ত। সিংজীকে বলতে হয় না কিছু। জয়ন্তর চোখের সামনে গেটের অপর দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন ধরণীধর নিজে। সঙ্গে তার আর একজন নেপালী অনুচর।—হুকুম দিয়েছি আমি—বজ্রগম্ভীর স্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে ধরণীধরের,—সাধারণের সম্পাদক হয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছিলেন না? ঘুড়ি যে ওপরে তুলতে পারে গুটিয়ে নেবার সুতো লাটাই যে তারই হাতে, সেটুকু ভুলে গিয়েছিলেন—কেমন? উপায় নেই। চোখের সামনে লৌহ-প্রাচীর। তার এদিকে বড় অসহায় জয়ন্ত। কিন্তু উপায়ের পথ ত শুধু একটা নয়। দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত—আরও কঠিন হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ—। বলে, দারোয়ান দিয়ে প্রেসের দরজা আটকে কি আমার কলম বন্ধ করতে পারবেন ধরণীবাবু! সাধারণ ছাড়া কি আর কাগজ নেই? বাঁকা হাসি হেসে ওঠেন ধরণীধর।—আছে বই কি, একবার নতুন খবরেই গিয়ে দেখুন না! হাসিতে আরও কুটীল হয় ওর মুখ। কুঞ্জর দিকে

তাকিয়ে বলেন, আসুন কুঞ্জবাবু। কুঞ্জ চিন্তিত হয়। আবার যাবে সে? জয়ন্তকে কথা দেবার পরও সে নিজেকে বিকিয়ে দেবে আবার?....একটু ভেবে নিয়ে আপন মনেই মাথা নাড়ে কুঞ্জ। তারপর কোন কথা না বলে প্রবেশ করে ভেতরে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। তারপর ধীরে ধীরে নেমে পড়ে পথে।

চেনা পথ। উড়ে চলবার কথা, কিন্তু পথ জুড়ে অতি মন্থর পায়ে চলেছে জয়ন্ত! অবসাদের শিথিলতা জড়িয়ে রয়েছে পায়ে পায়ে। ক্লান্তিহর রাত্রি শেষের যে প্রভাত, সে যে এমনি করে আনবে বিস্ময়ের জ্বর, আর হতাশার ক্লেশ, কে জানতো? গলিতে ঢুকল জয়ন্ত। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় লক্ষ্য করে নি, এখন ঢোকবার সময় কান পেতে জানল গলিটা বোবা, নিতান্তই বোবা। কোন শব্দ নেই, যে শব্দ খুশির মনে প্রশ্ন তুলেছিল একদিন। গতরাত্রের হাসপাতালের স্তব্ধতার কথা মনে পড়ল জয়ন্তর। জীবনে সেই ওর প্রথম হাসপাতালে যাওয়া, তাই ঘটনাটা মনে দাগ কেটেছে বেশি করে। আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা নিবারণবাবুর সেই নিঃসাড় দেহ! জয়ন্তর মনে হল শব্দহীন, কর্মহীন নতুন খবরের ভাঙা বাড়িটা একই ভাবে আহত হয়ে পড়ে আছে গলির টিম-টিমে আলোয় নিঃশব্দে একধারে। দরজার দেওয়ালে আদালতের নোটিস লটকানো। নিলামের নোটিস। জয়ন্তর ভুরু দুটো কেঁপে উঠল। একজন লোক দাঁড়িয়ে। অচেনা। বোধ হয় আদালতেরই লোক। জয়ন্ত প্রশ্ন করে অন্যমনস্ক হয়ে, কি ব্যাপার কি?

—নিলেম মশাই, নিলেম! দেনার দায়ে প্রেস নিলেম হবে ৭ই আগস্ট তারিখে। বলে লোকটি।

—প্রেস নিলেম হবে! উচ্চারণ করে জয়ন্ত সমঝাতে চায় আরও।

—হ্যাঁ নিলেম হবে। আর একটি স্বর শোনা যায় বারান্দা থেকে। জয়ন্ত চোখ তুলে তাকাল একবার প্রণতির দিকে। প্রণতির

হাতে একখানা কাগজ। বোধ হয় আজকের সাধারণ। বললে, খবরটায় আপনার এত অবাক হবার ত কিছু নেই জয়ন্তবাবু!

—তার মানে? কে প্রেস নিলেম করাচ্ছে—কে?

—কে নিলেম করাচ্ছে আপনি ভাল করেই জানেন। তবু যদি খবরটা আমার মুখ থেকে শুনে উপভোগ করতে চান ত শুনুন—নিজের মনুষ্যত্ব যার কাছে বিকিয়ে দিয়ে এই লেখা আপনি লিখতে পেরেছেন, সেই ধরণীবাবুই প্রেস নিলেমে তুলেছেন!—হাতের কাগজখানা মেলে ধরেছে প্রণতি চোখের সামনে। ইচ্ছে করেই তাকাল না জয়ন্ত কাগজের দিকে। সোজাসুজি তাকাল প্রণতির মুখের দিকে। সাধারণের আজকের লেখা পড়েই তোমার তাহলে এই ধারণা হয়েছে! কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর প্রণতি—

কথাটা শেষ করবার সুযোগ না দিয়েই প্রণতি বলে উঠল—বিশ্বাস আপনাকে আর কত করব জয়ন্তবাবু! আগাগোড়া আমাদের বিশ্বাসের যা মর্যাদা রেখে আসছেন, তারপরও বিশ্বাস করতে বলেন! বিষণ্ণ প্রণতির স্বর, বিপন্ন তার দৃষ্টি। ওকে দেখাচ্ছে যেন জলহীন নদী-রেখার মত। চলে যাচ্ছিল ও ঘরের মধ্যে; তবু জয়ন্ত আর একবার ডাকল—শোন প্রণতি—

প্রণতি দাঁড়াল। একেবারে প্রত্যাখ্যান করল না জয়ন্তর অনুরোধ। উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল জয়ন্ত, এখন তুমি উত্তেজিত, আমার মুখের কথায় কিছুই তুমি বিশ্বাস করবে না আমি জানি, সে চেষ্টাও তাই করব না। হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তোমার বাবাকে তুমি বাড়িতে নিয়ে এসেছ, তাঁর সঙ্গে শুধু একটু দেখা করে যেতে চাই!

—না, না, না। বাবার সঙ্গে দেখা করবার কোন দরকার আর নেই—ঝড় লেগে এলোমেলো পাতা ঝরার মত এলোমেলো বলে উঠল প্রণতি, চুলগুলো ওর ফুলে-ফেঁপে দুলে উঠল—কোন দরকার নেই! এখনো আপনার সম্বন্ধে তাঁর খুব বড় ধারণা। সেই ভুল

ধরণা নিয়েই তাঁকে থাকতে দিন। আমাদের অনেক উপকার আপনি করেছেন, আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে শেষ উপকারটুকু করুন।

দ্বার রুদ্ধ! যেন ছায়া-হীন খর-রোদের পথ। ক্লান্তিহীন চলা সেখানের ধর্ম। জয়ন্ত চেয়ে রইল অবসন্ন চোখ নিয়ে।

॥ বারো ॥

মনটাকে ফেলে রেখে, শুধু হাত-পাগুলোকে টেনে টেনে গলি পার করে জয়ন্ত বাড়িতে এসে পৌঁছল। কী এক দুঃসহ চিন্তার ঢেউ তাকে দোলা দিচ্ছে। সে ঢেউ তুফানের মত আছড়ে ফেলে দেবে তাকে জীবনের কক্ষপথ থেকে! পড়ে থাকবে সে ভাঙা খেলনার মত! প্রণতি তাকে কি ভুলই বুঝবে শুধু! বিশ্বাস ফিরে পাবার বিশ্বাস আব কি পাওয়া যাবে না।···যন্ত্রেব মত বাড়ি ঢুকল জয়ন্ত। বাড়ি ঢুকতেই জানতে পারল আর এক কতবড় বিপদ ওৎ পেতে আছে তাব জন্যে। দবজায় দাঁড়িয়েছিল দুর্লভ। ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল। চোখ উঠল কপালে।—এই যে দাদাবাবু তুমি এসেছ! শীগগীর যাও দাদাবাবু, দিদিমণির ভয়ানক অসুখ, ডাক্তারবাবু বসে আছে।

জয়ন্ত চমকে ওঠে—কি বলছিস কি?

—কি বলছি ঘরে গিয়ে দেখ না! আমার আর দেরি করবাব সময় নেই। বরফ আনতে যাচ্ছি।

পর্দার ছবি বদলাবার মত এক নিমেষে সব বদলে ওলোট-পালোট হয়ে গেল জয়ন্তর মাথার মধ্যে! ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেল খুশির কাছে। সরকার মশাই বললেন, হঠাৎ খুশির জ্বর এসেছে কাল রাত্তিরে, আজ সকালে অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তার ডেকে এনেছেন তিনি।

ডাক্তারবাবুও বিশেষ সুবিধের মনে করছেন না। এত জ্বর তার ওপর আবার বিকার, ভুল বকা।

ডাক্তারবাবু বললেন জয়ন্তকে, এখন থেকেই সাবধান হওয়া দরকার। এখানে আপনাদের আর কে আছে?

—আমি ছাড়া আর কেউ ত নেই! আর যা লোকজন—

—বাড়ির মেয়েরা কেউ নেই!

—না. কেন বলুন ত?

—প্রপার নার্সিংয়ের প্রয়োজন! সেটা ত মেয়েরাই ভাল পারেন, তাই বলছিলাম। সারারাত জেগে আইস ব্যাগ দেওয়া—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ান, টেম্পারেচার নেওয়া, সব কিছু কি পারবেন আপনারা?

—কেউ যখন নেই তখন পারতেই হবে। মেয়েরা যা পারে, পুরুষরা তা পারে না একথা মানতে আমি রাজি নই! স্বভাবসুলভ সংকল্পের জোরে কথা বলে জয়ন্ত! অভিজ্ঞতার হাসি হাসেন ডাক্তারবাবু। বলেন, দু' এক ক্ষেত্রে তা মানতেই হয়। যাই হোক যা যা বলে দিয়েছি ঠিকমত করবেন। আজ যদি টেম্পারেচার নেমে যায় তবেই ভাল। কাল সকালে আবার আসব।

ডাক্তারবাবুকে এগিয়ে দিয়ে এসে জয়ন্ত খুশির বিছানার ধারে এসে বসে। গায়ে-মাথায় হাত বুলোয়! প্রার্থনা করে খুশি ভাল হয়ে উঠুক। প্রার্থনা করে যে বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে তার ঘাড়ে, তা বহন করবার মত শক্তি যেন সে অর্জন করতে পারে। তবেই ত স্বর্গত বাবা-মায়ের আশীর্বাদের যোগ্য সে হবে! সস্নেহে বলে, হ্যাঁরে খুশি, বড্ড কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

শুকনো মুখ নিয়ে ক্লিষ্টস্বরে বলে খুশি, হ্যাঁ। প্রণতিদিকে ডাক না দাদা।

পর্দার ওপর দুটো ছবি এক সঙ্গে এসে পড়েছে। দুটোই সমান উজ্জ্বল, সমান স্পষ্ট! আশ্চর্য! জয়ন্ত বলে, প্রণতিদিকে কি দরকার? আমি ত রয়েছি।

—না, না, তুমি পারবে না, তাকে ডাকো। জয়ন্ত চিন্তিত হয়। বলে, সে আসবে না! ভেবেছিল এতেই চুপ করবে খুশি কিন্তু তা নয়, খুশি তখনও জিদ ধরে আছে।—ঠিক আসবে দেখো। আমার অসুখ শুনলেই ঠিক ছুটে আসবে। একবারটি ডেকে পাঠাও না দাদা! জয়ন্তর স্বর কর্কশ হয় এবার।—না, না, কি হবে ডেকে পাঠিয়ে! সে আমাদের কে, যে আসবে!

ছবি দুটো কি আর স্পষ্ট নেই? তাদের ঔজ্জ্বল্য কি ধুয়ে যাচ্ছে?

আইসব্যাগ হাতে নিয়ে জয়ন্ত নিজেই রাত জাগবার জন্যে প্রস্তুত হল। সবই করবে সে নিজে হাতে। ইচ্ছে থাকলে কি না হয়? কি না পারা যায়? দুর্লভ বসে আছে ঘরের এককোণে, প্রয়োজনমত সে-ও সাহায্য করবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু! ন'টার সময় একবার খাওয়ান হয়েছিল। আবার রাত দশটায় একবার দিতে হবে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসছিল জয়ন্ত। দশটা বেজে যাবার কয়েক মিনিট পরে খেয়াল হল জয়ন্তর।—এই দুর্লভ!

—আজ্ঞে!

—কটা বেজেছে খেয়াল আছে। দশটায় না ওষুধ দেবার কথা! একটা ব্যাপারে যদি হুঁস থাকে!

—আজ্ঞে আপনিও ত বলে যাও নি। মাথা চুলকায় দুর্লভ!

—ভূত কোথাকার! অকর্মার ধাড়ি! ধর আইসব্যাগটা! আইসব্যাগটা হাতে দিয়ে জয়ন্ত নিজে ওষুধ খাওয়াতে বসে। খুশির মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, খুশি এটা খেয়ে নে খুশি···খেয়ে নে····

নিজে খাওয়ার মত অবস্থা নয় ওর! খাইয়ে দিতে হয় জয়ন্তকে। অভ্যেস নেই। কাজেই খানিকটা গড়িয়ে পড়ে বাইরে।

—নাঃ, পড়েই গেল। নিজের অসম্পূর্ণতায় নিজের ওপর বিরক্ত হয় জয়ন্ত!

—আপনি যে ঠিক দিতে জান না! খাতির না করেই বলে দুর্লভ।

—আমি জানি না ত কে জানে শুনি। তুমি? বিরক্ত হয়ে ওঠে জয়ন্ত দুর্লভের ওপর! ভারি অসভ্য চাকর ত! নেহাৎ বিপদের সময় তাই—

দুর্লভ অম্লানবদনে বলে, যে জানে তাকে ডেকে আনব? কি বলতে চায় দুর্লভ জয়ন্ত বোঝে। তাই ওর কথায় কান না দিয়ে খুশির দিকে মন দেয় আবার—এটুকু খেয়ে নে খুশি। খুশি খাবে না। আপনমনে বকে চলেছে সে। কখনও ডাকছে কাকাবাবুকে, কখনও প্রণতিকে।—না, না, কাকাবাবু, দাদা আমায় যেতে দেবে না ....প্রণতিদিকে ডেকে আন না কাকাবাবু! ডাকলেই ঠিক আসবে ...খুশির কথা শুনে উৎসাহ বাড়ে দুর্লভের! বলে, ও বাড়ির দিদিমণিকে ডেকে আনব দাদাবাবু!

—ডাকলেই সে আসবে কেন শুনি? কি তার দায় পড়েছে?

—আমার অসুখ করেছে শুনলেই আসবে···ডেকে আন না দাদা? খুশিও বলতে থাকে জয়ন্তকে। দুর্লভ বোঝে জয়ন্ত হয়ত আর না করতে পারবে না। কাজেই সে বেরিয়ে পড়ে তখুনি। প্রণতিকে বলতে গিয়ে আরও বিপন্ন বোধ করে দুর্লভ। খুশির অসুখ শুনে বিচলিত হয় প্রণতি, কিন্তু তাকে যেতে হবে শুনে হয় স্থির! বলে, তোমার দাদাবাবু কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছে? দুর্লভ চতুরভাবে গুছিয়ে জবাব দেয়—মুখ ফুটে তেনায় কিছু বলে নি, তবে আপনার জন্যেই পথ চেয়ে বসে আছে···আপনি একবার চল দিদিমণি·····

—না দুর্লভ, আমার যাওয়ার কোন উপায় নেই। তোমরা ভাল করে সেবা কর, আমি বলছি খুশি ভাল হয়ে উঠবে!

—কিন্তু আমরা যে কিছু জানি না দিদিমণি! হতাশায় ভেঙে পড়ে বলে দুর্লভ—দাদাবাবুর মাথায় যে আকাশ ভেঙে পড়েছে।

—আকাশ আমার মাথায়ও ভেঙে পড়েছে দুর্লভ। বিপদ

আমারও বড় কম যাচ্ছে না। তবু কারও পথ চেয়ে আমি বসে নেই। না দুর্লভ তুমি যাও, ও বাড়িতে আমি যেতে পারব না। কি যেন সামলে নিল প্রণতি, কণ্ঠে আর চোখে। তারপর ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে! তার মন জুড়ে যেন একটা বেদনার সুর বাজছে। ফুল-ঝরা বৃন্তের যে বেদনা তারই মত করুণ সে সুর!

অনেক বড় মুখ করে ডাকতে গিয়েছিল দুর্লভ প্রণতিকে। কিন্তু ফিরল এতটুকু হয়ে। কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ও বাড়ির দিদিমণির কাছে গেছলাম! দিদিমণি এল না দাদাবাবু, বললে, তার বড় বিপদ আসতে পারবে না। আবার প্রত্যাখ্যান! রেগে গিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল জয়ন্ত, পাজি আহাম্মুক কোথাকার! কে তোকে বলেছিল বাহাদুরি করে ও বাড়ি যেতে! কে বলেছিল তাকে সেধে গিয়ে ডাকতে! ওরা কি আমাদের আপনার জন, যে আমার বিপদে আসবে! কি সম্পর্ক আমার—মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল জয়ন্তর। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণতি। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকছে! কোন নিভৃতে দেখা স্বপ্নের মত দেখাচ্ছে ওকে।—ধন্যবাদ! সম্পর্ক যে কিছু নেই সেটুকু মনে করলেই বাধিত হবো। খুশির সেবা করা তাহলে আমার পক্ষে সহজ হবে!—জয়ন্তকে অতিক্রম করে প্রণতি খুশির বিছানায় গিয়ে বসে। তুলে নেয় আইসব্যাগ—বলতে হয় না। ওই বলে, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন!

—কিন্তু···তুমি একা·····!

—একাই আমি থাকতে চাই, দরকার হলে দুর্লভকে ডাকব। যান। প্রণতিকে আসতে বলে নি জয়ন্ত, তবুও এল। জয়ন্তকে যেতে বলল প্রণতি, জয়ন্ত বেরিয়ে গেল।

ভোর বেলা দেখা। শুকতারার মত ক্লান্ত রাত-জাগা প্রণতির মুখ। কিন্তু ভোরের মতই পরিচ্ছন্ন লাগল জয়ন্তর কাছে। প্রণতি বললে, জ্বর একদম ছেড়ে গেছে। ডাক্তারবাবুকে তবু একবার ডেকে পাঠাবেন!

—আচ্ছা। তুমি যা করলে তার জন্যে—ইতস্ততঃ করছিল জয়ন্ত, প্রণতিই কুড়িয়ে নিয়ে কথাটা শেষ করল, তার জন্যে ইচ্ছে করলে ধন্যবাদ দিতে পারেন। তার লোভেই ত এসেছিলাম। হেসে প্রণতি যেন কাঁদাতে চাইল জয়ন্তকে।

—তুমি কি কেবলই ভুল বুঝবে, আমায় কৈফিয়তের অবকাশও দেবে না?

—কৈফিয়তের দরকার নেই। আমি আপনার বিচারক নই।

—শোন প্রণতি, আমায় একবারটি বোঝবার চেষ্টা কর। তোমাদের প্রেস যে নিলেমে উঠেছে তার কিছুই আমি জানতাম না। কি করে এ নিলেম বন্ধ করা যায়, তাই শুধু এখন ভাবছি!

—অত ভাববার কি দরকার? নিলেমে যখন উঠেছে, যে খুশি কিনে নেবে। এ প্রেসের ওপর লোভ আপনারও ত কম ছিল না। ইচ্ছে করলে আপনিও নিতে পারেন। কথা শেষ করে প্রণতি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

—আমিও কিনে নিতে পারি? হ্যাঁ, আমিও কিনে নিতে পারি, বার বার কথাটা উচ্চারণ করে জয়ন্ত। আঘাত দিতে চেয়েছে প্রণতি, মোচড় দিয়েছে বুকের কাছটায়। তা দিক্। তবেই ত যন্ত্র বাঁধা হবে। যে যন্ত্রে বাজবে মিলনের সুর! জয়ন্ত এই আঘাতকে ফুল বলে মানল।

॥ তেরো ॥

প্রণতি বুঝল না জয়ন্তকে। একটা সুযোগও দিল না। কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পথ বলে দিয়েছে সে ওকে। যে পথে সুযোগের অন্ত থাকবে না প্রণতির কাছে নিজেকে সহজ করে মেলে ধরবার। হ্যাঁ, যে প্রণতি কথা রাখে নি, সেই প্রণতির উপহাস-টুকুকেও অবহেলা করবে না সে। জয়ন্ত মনকে দৃঢ় করল—কিন্তু

কি করে তা হবে। টাকা আসবে কোথা থেকে? একটা প্রেসের দাম ত বড় কম নয়, তাও আবার নিলেমে ডাকতে হবে ধরণীধরকে পাল্লা দিয়ে। না, কোন আশা নেই। কোন সম্ভাবনা নেই! সমস্ত মন প্রাণ এক করে উপায় খোঁজে জয়ন্ত। হঠাৎ যেন সন্ধান মিলে যায়! যদিও বড় বিপদজনক সে পথ, অতিরিক্ত দায়িত্বপূর্ণ তার ভার,—তবু উপায়ন্তর না পেয়ে সেই পথই গ্রহণ করে জয়ন্ত। ওদের এই বাড়িটা বাঁধা দেয় এক অ্যাটর্নির অফিসে। বেশি টাকার ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা নেই ওর। মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা—ঐ স্বল্প টাকার বিনিময়েই বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেয় জয়ন্ত অ্যাটর্নির হাতে। অ্যাটর্নি পাকা লোক। লোভ দেখায় জয়ন্তকে। বলে, এত বড় বাড়ি মোটে ত্রিশ হাজার টাকা কেন, আরও অনেক বেশি পাওয়া যাবে একটু দেরী করলে। কিন্তু জয়ন্ত কান দেয় না ও কথায়। দেরী করবার মত সময় নেই তার। আর ত্রিশ হাজার টাকার বেশি টাকাই বা সে নেয় কোন্ সাহসে! আগামী কাল নিলেমের দিন। সেদিন আবার ইলেক্‌শন। ধরণীধরের দল ডবল জয়ের আশায় এখন থেকেই উৎফুল্ল হয়ে আছে। ইলেক্‌শনের ফলাফলে জয়ন্তদের করবার কিছু নেই। কিন্তু প্রেসের নিলেমে যাতে ওরা জিততে পারে তার ব্যবস্থাটা করছে জয়ন্ত! অবশ্য সে জানে এ চেষ্টাও হয়ত তার সফল হবে না। ত্রিশ হাজার টাকা টাকাই নয় ধরণীধরের কাছে। কিন্তু তবু, বিনা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নেবার মত কাপুরুষতা সহ্য করতে পারবে না সে। যুদ্ধ করেই হারবে। যুদ্ধের আগে নয়।

এত হতাশার দিনেও বলাই, ছোটেলালের দল উৎসাহিত না হয়ে পারে না। এই ত্রিশ হাজার টাকা আজকে ওদের কাছে লাখ টাকার মত। ধরণীধরের লোক একটু হতভম্ব হবে, এরা ডাকছে দেখে! উৎসাহিত হবেন নিবারণবাবু, যে এত বিপদের দিনেও জয়ন্ত এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে! এই দুঃসাহস ভুল হোক, ছেলেমানুষী হোক, কিন্তু কণ্টকসম ভুল বোঝার পালা ত শেষ হবে। জয়ন্ত ঠিক করেছে

নিজে সে ডাকবে না। ছোটেলালকে পাঠিয়ে দেবে! সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ছোটেলাল যখন পাল্লা দেবে ধরণীধরের লোকের সঙ্গে—তখন, লোকে জানবে নতুন খবর এতদিন ধরে যে ছোটেলাল-দের নিজেদের সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়ে আসছে, সে-কথা মিথ্যে নয়। যাদের প্রাণের জিনিস তারা মান বাঁচাতে এসেছে চরম দিনে!

সকাল থেকে নতুন খবরের অফিস যেন মরে গেছে! শব্দ নেই, ছন্দ নেই। গলি পর্যন্ত কেমন যেন থমথমে ভাব। লোক এসেছে কোর্ট থেকে। চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে একধারে। বেলা এগারোটা থেকে নিলাম ডাকা চলবে। তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন নিবারণবাবু! চলে যাচ্ছে প্রণতি। যে স্বপ্নকে এতদিন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে, সেই স্বপ্নকে চোখের সামনে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে যেতে দেখবেন কি করে? অতীতের সব সাধনা এই নিষ্ঠুরতম বর্তমানের পাথরে মাথা কুটে মরবে—তা তিনি দেখবেন কি করে?···প্রণতিও যাবে! সে যাবে তার ভবিষ্যৎকে ফেলে রেখে, ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে। শেষ সময়ে বাধা দিতে এল ছোটেলাল। অবাক হয়ে গেলেন নিবারণবাবু! ছোটেলালের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! না কিছু একটা গণ্ডগোল করে বসবে সে নিলামের সময়। বলা যায় না, ছোটেলাল রেগে গেলে সব পারে! নিলামের বাঁকা পথ বুঝবে না ও। তবে ওর হাতের লাঠির সোজা পথটা বোঝে সহজেই!

নিবারণবাবু বলেন, চোখের সামনে এ ব্যাপার কি করে দেখব ছোটেলাল!

—না, না, একটু দাঁড়ান বাবু—

—কি করে আর দাঁড়াই! দুটি সন্তান আমার ছিল, প্রণতি আর এই প্রেস। তার একটিকে দুষমণে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নিজের চোখে তাই তুমি দেখতে বল?

—আমার একটা বাৎ শুনেন, একটু থাকেন নিবারণবাবু—। ছোটেলাল কিছুতেই ছাড়বে না। ওর কথায়, ওর হাসিতে যেন কিসের একটা নতুনতর খবর উঁকি দিচ্ছে! কি যেন বলতে চায় ও! নিবারণবাবু এই মুহূর্তেও তাই আশা ছাড়তে পারেন না! ছাড়তে পারেন না প্রেস ঘরের মাটি!

মন্দ লোক হয় নি নিলামে। খবর পেয়ে অনেকে এসেছে। প্রেসের আজকাল যেরকম দর! ডাক শুরু হয়ে গেছে। ধরণীধরের তরফ থেকে এসেছে হরিহর। হরিহর প্রথম ডাক দিয়েছে—পাঁচ হাজার। একজন—সাত হাজার। আর একজন—বারো হাজার! হরিহর—তেরো হাজার! হঠাৎ ওদের মাঝখান থেকে ছোটেলাল হেঁকে ওঠে, পনেরো হাজার! নিলামদার একবার তাকিয়ে দেখে ছোটেলালের দিকে। বিস্মিত না হয়ে পারে না। ছোটেলাল বলে, হাঁ, হাঁ, পনেরো হাজার!

নিবারণবাবু চীৎকার করে ওঠেন—কি করছ কি ছোটেলাল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

—হাঁ, হাঁ, পাগল হয়ে গেছি।

নিলামদার হাঁকছে—পনেরো হাজার! হরিহর—সতেরো হাজার! ছোটেলাল—আঠারো হাজার! নিবারণবাবুর আবার চীৎকার—ছোটেলাল!

—হাঁ, হাঁ,আঠারো হাজার। কিছু ভাববেন না নিবারণবাবু!

নিলামদার হাঁকছে—আঠারো হাজার—আঠারো হাজার! হরিহর আবার চড়িয়ে দেয়—উনিশ হাজার....উত্তেজিত হয়ে ওঠে সকলে। রোখ চেপে গেছে এদের। তা না হলে এই প্রেসের দাম ওঠে উনিশ হাজার!

গলির ও-প্রান্তে চলেছে নিলামের ডাক আর এ-প্রান্তে জয়ন্তর বাড়িতে এসে রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছেন

না কারও। খুশির অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন তিনি। থাকতে পারেন নি। ওরা ওকে ছাড়লেও উনি কোন্ প্রাণে ছেড়ে থাকবেন ওদেরকে—খুশিকে ?

কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে খুশি মহাখুশি হয়ে ওঠে—ও মা, কাকাবাবু এসেছে! কথাটা নিজের কাছেই নিজে ঘোষণা করে।

—হ্যাঁ, এসেছি। রাগে আর আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে কাকাবাবু বলেন, সেই হতভাগাকে জেলে দিতে এসেছি। তোর অসুখ করেছে কিন্তু সে আমায় খবর দেয় নি। মেয়েটাকে মারবার বন্দোবস্ত করেছিল।

খুশি কাকাবাবুকে শান্ত করবার জন্যে বলে, আমার অসুখ ত সেরে গেছে।

—সেরে গেছে! কিন্তু না সেরে যদি বাড়ত, যদি একটা কিছু হত! কি করত সে! কোথায়? কোথায় সে হতভাগা? জয়ন্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কাকাবাবু। ওকে আজ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে তবে উনি ছাড়বেন। কিন্তু জয়ন্ত তখন নিলামে গেছে তার দলবল নিয়ে। যদি উদ্ধার করতে পারে প্রেসটা। সে কি এখন ফিরবে? ওঁর হাঁকডাক শুনে দুর্লভ ছুটে আসে।—আজ্ঞে এই যে আমি এসেছি।

—তুমি কে? আরও রেগে ওঠেন কাকাবাবু—তুমি কে? তোমায় আমি ডেকেছি?

—আজ্ঞে, আপনি ওই যে হতভাগা বলে ডাকলে? আমায় আদর করে সবাই ওই নামে ডাকে কি না?

—বদ্ধ পাগল লোকটা। কাকাবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমায় নয় হতভাগা! আমি জয়ন্তকে খুঁজছি!

—দাদাবাবুকে খুঁজছ? একগাল হেসে দুর্লভ বলে, দাদাবাবু ত নিলেম হয়ে গেছে!

—নিলেম হয়ে গেছে! কাকাবাবুর রাগ আর থামে না। আরও চীৎকার করেন তিনি!

—না, না, নিলেম হয় নি, নিলেম ডাকতে গেছে। এই গলির ওধারে প্রেস নিলেম হচ্ছে কি না—তাই ডাকতে গেছে!

খুশি এবার বকুনি দেয়। জয়ন্ত বার বার বলে গেছে এ সব কথা আর কাউকে না বলতে, অথচ দুর্লভটা এমন যে, এক কথায় সব বলে দিচ্ছে কাকাবাবুকে। খুশি তাই বকে ওঠে,—এসব কথা তোমায় কে বলতে বলেছে ঠাকুর? দাদা না বারণ করে দিয়েছিল!

—হ্যাঁ, তা করেছিল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে দুর্লভ,—তা আমি কি আর সব বলেছি? দাদাবাবু যে এ বাড়ি বাঁধা দিয়ে নিলেম ডাকতে গেছে তা কিন্তু এখনও বলি নি!

খুশির গা জ্বলে ওঠে। আচ্ছা পাজী ত? বলব না বলব না করে সব বলে দিচ্ছে। বাড়ি বাঁধার নাম শুনে আঁৎকে ওঠেন কাকাবাবু।—বাড়ি বাঁধা দিয়ে নিলেম ডাকতে গেছে!

সে আমি বলবু নি, বারণ আছে বলতে। আমি চুপি চুপি সব শুনমু কি না! বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে এল, ওই খোট্টাটাকে ডাকল—না বাবু আমি কিচ্ছু বলবু নি!···

—আচ্ছা আর কিছু বলতে হবে না। নিলেম ডাকা তার আমি বার করছি। আর কোন কথা নয়। রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ দুম দুম করে বেরিয়ে যান প্রেসের উদ্দেশ্যে!

এদিকে ডাক উঠেছে পঁচিশ হাজারের কোঠায়। ঝিমিয়ে আসছে ছোটেলাল। আর ভরসা নেই! জয়ন্ত নিজে ডাকছে এবার। ছাব্বিশ —সাতাশ—ঠিক এই সময়েই এসে ঢোকেন কাকাবাবু। না দুর্লভটা যতই হতভাগা হোক মিথ্যে কথা সে তাহলে বলে নি। রায়বাহাদুর চীৎকার করে ওঠেন ক্ষিপ্ত হয়ে, হতভাগা! তুমি বাড়ি বন্ধক দিয়ে এখানে নিলেম ডাকতে এসেছ—বাড়ি তোমার একলার?—খুশিকে তুমি ভাসিয়ে দিতে চাও! ঘরটা থমথম করতে থাকে, সকলে নির্বাক বিস্ময়ে। জয়ন্ত একবারে ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় কাকাবাবুর দিকে, তারপর ডেকে চলে—সাতাশ হাজার—সাতাশ হাজার—!

—সাতাশ হাজার। তোমায় আমি জেলে দেব পাজী কোথাকার। টাকা তোমার খোলামকুচি! সমস্ত পারিপার্শিক ভুলে গিয়ে রায়-বাহাদুর শাসন করতে থাকেন জয়ন্তকে। স্তম্ভিত হয়ে দেখেন নিবারণবাবু! শোনে প্রণতি! তাহলে জয়ন্ত তার বাড়ি বাঁধা দিয়ে নিলেম ডাকতে এসেছে! এতবড় বাঁধন সে মেনে নিয়েছে নতুন খবরের জন্যে! জয়ন্ত একটুও দমে না কাকাবাবুর চীৎকারে। বরং একটু মেজাজ দেখিয়েই বলে, আঃ, একটু থামুন না আপনি! —হরিহর দর বাড়াচ্ছে ওদিকে—আটাশ হাজার!—জয়ন্তর মনে হয় এখুনি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে···পাদুটো টলছে। আটাশ হাজার! তারপর উনত্রিশ—তারপর ত্রিশ—তারপর—? তারপর মনে হয় মস্ত এক কালো মেঘের মত ফাঁকা অন্ধকার ঘিরে ফেলেছে তাকে চারপাশে—! কিন্তু তবু যতক্ষণ আশা। জয়ন্ত উচ্চারণ করবার চেষ্টা করে—উনত্রিশ হাজার। কিন্তু তার আগেই কাকাবাবু ধমকে ওঠেন, খবরদার বলছি, আর একটি কথা নয়। ঐ ধমকেই প্রেরণা পায় জয়ন্ত। তার এলানো স্নায়ু আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বলে, দোহাই আপনার কাকাবাবু, এখন আর বাধা দেবেন না—

নিলামদার সময় গুণছে—আটাশ হাজার এক—আটাশ হাজার দুই·····

জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—উনত্রিশ হাজার!

—উনত্রিশ হাজার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! কাকাবাবু যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন!

—মাথা খারাপই হবে কাকাবাবু। ওদের কাছে হারলে জীবনে এ মুখ আর কাউকে দেখাতে পারব না।

নিলামদার সময় নিচ্ছে আবার—উনত্রিশ হাজার এক···উনত্রিশ হাজার দুই···। হরিহর বাজি মাৎ করার মত চীৎকার করে ওঠে—বত্রিশ হাজার। দপ করে যেন মাথার ভিতরটা জ্বলে ওঠে জয়ন্তর। বজ্রাঘাত হয়ে গেল যেন। ছোটেলালের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার

টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে কাকাবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এই নিন কাকাবাবু বাড়ি বন্ধকের টাকা। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে, কিছুই খোয়া যায় নি!

কোন কথাই কানে যাচ্ছে না কাকাবাবুর। শুধু একটি কথা দাগ কেটে বসে গেছে তখন। কথাটা জয়ন্তর—ওদের কাছে হারলে জীবনে এ মুখ আর কাউকে দেখাতে পারব না!···চৌধুরী বংশের অভিজাত রক্ত ধমনীতে ধমনীতে উত্তাল হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি যাচ্ছে বদলে····যে দৃষ্টিতে ফোটে অনাবিষ্কৃতপথ অরণ্যের মাঝে লক্ষ্য-সন্ধান করে নেবার আলো!···অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছেন রায়বাহাদুর। জয়ন্তর কথা শুনছেন না। হঠাৎ একটি শব্দ উচ্চারিত হল তাঁর মুখ দিয়ে। ঝন্ ঝন্ করে উঠল সকলের স্নায়ু। জোর গলায় ডাক দিলেন রায়বাহাদুর—পঁয়ত্রিশ হাজার! নিলামদারও চমকে ওঠে—পঁয়ত্রিশ হাজার! রায়বাহাদুর বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পঁয়ত্রিশ হাজার!

হরিহর বলে—ছত্রিশ হাজার! রায়বাহাদুর হাঁকেন—চল্লিশ হাজার, পঁয়তাল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার! একবার জয়ন্ত কাকাবাবুর হাত দুটো চেপে ধরে—কি করছেন কি কাকাবাবু!

—বেশ করছি! আমার আগে নিলেম ডেকে নেবে? হারিয়ে দেবে ওরা?—পঞ্চান্ন হাজার!

নিলামদার সময় গুণছে—পঞ্চান্ন হাজার···পঞ্চান্ন হাজার এক·· পঞ্চান্ন হাজার দুই···· হরিহর যেন এবার আর্তনাদ করে ওঠে—ষাট হাজার! এইটেই ওর শেষ ডাক। ধরণীধর ষাট হাজার পর্যন্ত ডাকতে বলে দিয়েছেন। অবশ্য ধরণীধর জানতেন ওর অর্ধেক ডাকলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

একই সঙ্গে রায়বাহাদুর হাঁকেন, সত্তর হাজার—আশী হাজার····! টাকা যেন খোলামকুচি। ইচ্ছেমত মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি!

নিলামদার তখনও সময় গুণছে—আশী হাজার এক....আশী

হাজার দুই···আশী হাজার তিন....। কোন প্রত্যুত্তর নেই! ঘর নিঃশব্দ।

পরমুহূর্তেই বিজয়োল্লাসে কোলাহল করে ওঠে ছোটেলাল-বলাইয়ের দল। বাইরে থেকেও একটা কোলাহল ভেসে আসছে যেন। ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' 'জয়হিন্দ্' শোনা যাচ্ছে। কি ব্যাপার? বাইরে বেরিয়ে আসে সকলে। একদল লোক এসে ঢুকছে গলিতে। হাসিতে ফেটে পড়ছে তারা—যোগজীবন হেরে গেছে···যোগজীবন মুর্দাবাদ! দলের মধ্যে কুঞ্জও ছিল। সকলকে পেরিয়ে কুঞ্জ এগিয়ে আসে। জয়ন্ত ওকেই প্রশ্ন করে, কি খবর?

—হেরে গেছে, গো-হারাণ হেরে গেছে যোগজীবন সমাদ্দার।

এত আনন্দে জয়ন্ত যেন স্থির থাকতে পারছে না।—বলতেও পারে না কিছু। কুঞ্জই বলে চলেছে—হারবে না, যা একটা ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া হয়েছে?

—ব্রহ্মাস্ত্র!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়ন্তবাবু আপনার সেই লেখা।

—আমার সে লেখা আজ বেরিয়েছে?

—হ্যাঁ, সেই 'শয়তানের মুখোশ' আজ বের করেছি জয়ন্তবাবু। না বার করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত যে হত না। জয়ন্তর হাত দুটো চেপে ধরে কুঞ্জ আবেগের সঙ্গে।—ধরণীধরের জন্যেই আপনার সঙ্গে সেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম, আজ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। সে ভাবতে পারে নি এ লেখা আজ বেরিয়ে ওদের সমস্ত কীর্তি এমন করে ফাঁস হয়ে যাবে।

জয়ন্ত জড়িয়ে ধরে কুঞ্জকে। সব অভিমান আজ তার দূর হয়ে গেছে। জয়ন্ত বলে, সত্যি আপনি এবার অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছেন কুঞ্জবাবু।

বিজয়ের উৎসব চলেছে। ঠিক এমনই সময় আর এক অমঙ্গলের

খবর এল। শোনা যাচ্ছে ধরণীধর নাকি নিলামে হেরে গিয়ে আহত বাঘের মত হয়ে উঠেছে। আজ রাত্রে গুণ্ডা দিয়ে লুট করাবে নবজীবন প্রেস! আইন দিয়ে যা হয় নি, বে-আইনী উপায়ে তাকে হাঁসিল করবে। কিন্তু আশ্চর্য, খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেল সবিতা দেবী নিজে। ধরণীধরের কাগজের মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা সবিতা দেবীকে চিনতে পারে নি জয়ন্ত। কি চায় ও? কি ওর পরিচয়? কেন ও বারবার আসে বিপদের সময়। ঠিক সময়ে সাবধান করে দেয় জয়ন্তকে। যে কথাগুলো বলে সেগুলোকে শোনায় সহজ কিন্তু বিছিয়ে নিয়ে ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করলে অনেক দূর গড়ায়। ধরণীধরও কি ঠিকমত চেনে সবিতা দেবীকে? কি জানি? জয়ন্তর সন্দেহ ঘোচে না।

খবরটা যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সন্দেহ নেই! রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ আগুন হয়ে ওঠেন। এত বড় আস্পধা? মগের মুল্লুক নাকি? কলকাতা শহরে বসে এই রকম গুণ্ডামী চলবে? কেন, পুলিস কি মরে গেছে নাকি! আইন নেই? শাসন নেই? বিচার নেই?—রায়বাহাদুরের রক্ত আবার উষ্ণ হয়ে উঠেছে, শিরায় শিরায় তাদের চাঞ্চল্য কোলাহলের মত যেন শোনা যায়। কিন্তু পুলিসকে ঠিক তখনও চেনেন নি ভবানীপ্রসাদ। তাই পুলিসের ভরসা করেছিলেন। থানায় এসে কিন্তু অবাক হলেন। থানার ও. সি. রীতিমত মেজাজ দেখিয়েই বললেন, সবই ত বুঝলুম, কিন্তু কাকে নিয়ে গেছে শুনেই কাকের পেছনে ত দৌড়তে পারি না। আগে গুণ্ডারা সত্যিই প্রেস লুট করতে আসুক, তখন দেখা যাবে।—টেবিলের ওপর একটা ঘুঁসি মেরে বলেন অফিসার।

রায়বাহাদুর বিস্মিত হয়ে নিষ্ফল চীৎকার করেন—লুট করে নিয়ে গেলে তখন আর কি দেখবেন!

—তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি বলুন! আপনার

গাঁজাখুরি গল্প শুনে ধরণীধর চৌধুরীকে গিয়ে গ্রেপ্তার করব, না আপনার প্রেসে কেল্লা থেকে মিলিটারি এনে পাহারা বসাব! ও. সি. না-রাগ না-উপহাসের হাসি হেসে ওঠেন।

রায়বাহাদুর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন—কী আমি গাঁজাখুরি গল্প বলছি। রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ চৌধুরীর কথার কোন দাম নেই!

—আপনার কথার কি দাম আছে জানিনা, তবে আমাদের সময়ের যথেষ্ট দাম আছে রায়বাহাদুর। মাপ করবেন।

একটু ভুল হয়েছিল রায়বাহাদুরের পুলিসকে চিনতে। ডান হাতের ঘুঁসিটা দেখেছিলেন টেবিলের ওপর, কিন্তু টেবিলের নীচের বাঁ হাতখানা লক্ষ্য করেন নি। সেইটেই তাঁর ভুল। জয়ন্ত অনেকবার বারণ করেছিল কাকাবাবুকে পুলিসে যেতে। নিবারণবাবুও বলেছিলেন, পুলিসের কাছে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। তবু অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলেন রায়বাহাদুর। ফিরলেন ভগ্ন মনোরথ হয়ে। জয়ন্ত বলে, কি হল কাকাবাবু? চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দিতে রায়বাহাদুর বললেন, না, ওদের বিশ্বাসই করাতে পারলুম না—আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে!

—তা যে দেবে আমরা জানতাম। একটু হেসে হেসেই বললেন নিবারণবাবু।—মরুভূমির কাছে আপনি গিয়েছিলেন জল চাইতে!

—তাই বলে এমনি নিরুপায় হয়ে মার খেতে হবে! রাত একটায় নাকি ওরা আসবে। ওদের হাতে অগাধ ক্ষমতা, অজস্র লোকজন, আর আমাদের সহায় সম্বল কিছুই যে নেই!

ঘরটা থমথম করতে থাকে ফাঁকা নৈঃশব্দে! ছোটেলাল দাঁড়িয়েছিল এককোণে। দেহাতী ছোটেলাল। চুপ করে শুনছিল ওদের কথা। ওদের সবার মুখের যখন কথা গেল ফুরিয়ে আর তার বদলে নামল ছায়া, তখন ছোটেলাল বলে উঠল, আপনি ত বহু কোশিস্ করেছেন কাকাবাবু, এবার হামার হাতে সব ছেড়ে দিন!

—তোমার হাতে ছেড়ে দেব! তুমি কি করবে! বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন রায়বাহাদুর। লোকটা সব ব্যাপারেই ঐ রকম বাহাদুরী দেখাতে চায়! মনে মনে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি ছোটেলালের ওপর! এসে অবধি দেখছেন ঐ খোট্টাটাকে ওরা বড় বেশি প্রশ্রয় দেয়! ছোটেলাল অল্প হাসে। বলে, দেখেন কি করতে পারি!

নিবারণবাবুর মুখের ওপর থেকে কালো ছায়াটা যেন সরে যাচ্ছে। এমনই ধরণের হেসেছিল ছোটেলাল প্রেস ধর্মঘটের দিন, আর সময় নিয়েছিল। কিন্তু এবারের বিপদ যে আরও ভয়ানক। এবারের শত্রু আরও শক্তিধর!

রাত একটার আর দেরী নেই। প্রায় মৃত কলকাতা শহর। রাজপথ। মোড়ে মোড়ে গোটা কতক রিক্সা দাঁড়িয়ে আর খানকয়েক ট্যাক্সি। মুমূর্ষু রুগীর মত ওদের ম্লান আলো টিম্ টিমে আর ঘোলাটে। সজাগ হয়েই ঢুলছে ওরা। শিকারীর মত ওদের কান। যাত্রী এলেই জেগে ওঠে। কে কোথায় মরল, কার ব্যথা ধরেছে, কার টলছে শরীর, এদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে এরা। রাত্রি পাহারা দিয়ে। রিক্সাওয়ালার দলের দিকে এগিয়ে আসে ছোটেলাল—ভাই সব—

—কেয়া হ্যায় ভাই! কাঁহা কেরায়া মাঙ্‌তা—চঞ্চল হয়ে ওঠে ওদের কুঁকড়ে-যাওয়া শরীর।

—কেরায়া নেই ভাই সব, তুম লোগোসে দোসরা কুচ মাঙ্‌তা। দুষমণ আয়া গুণ্ডা লেকে, মেরে ছাবাখানা তোড়নে লিয়ে—লুট করনে লিয়ে। হ্যায় কোই জোয়ান তুমারা ভিতর, দুষমণকো রোখনেওয়ালা, জুলুমবাজ:সে লড়নে:ওয়ালা, গরীব সাঁচ্চা আদমীকো বাঁচানেওয়ালা—

কালো রাত্রির ফাঁকে ফাঁকে লাল হাতছানি শোনে রিক্সা-ওয়ালারা। মরা রক্ত চন্ চন্ করে ওঠে।—হ্যায়, হ্যায়, হামলোক সব কোই হ্যায়....!

—কোন্ রোখেঙ্গে দুষমণকো, ইনসানিকে লিয়ে কৌন লড়েঙ্গে শয়তান জুলুমবাজকে সাথ—ছোটেলাল ডেকে চলেছে তখনও··· রিক্সাওয়ালা থেকে ট্যাক্সিওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা থেকে ফেরী-ওয়ালা....এত রাতে যাঁরা পড়ে থাকে পথে, পথের ধারে, এমন সব জীবকে ডেকে চলেছে ছোটেলাল। রাত একটার আর বড় দেরী নেই!

ধরণীধর ভদ্রলোক। এক কথার মানুষ। সময়ের নড়চড় নেই। একটার সময় হাজির হয়েছেন দলবল নিয়ে। বাইরে সকলকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢোকেন তিনি জনদুয়েককে মাত্র সঙ্গে নিয়ে। এত রাত্রেও দরজা খোলা। ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন রায়-বাহাদুর, নিবারণবাবু···জয়ন্ত···। ধরণীধর বিনা বাধায় ভেতরে গিয়ে ঢোকেন।—কোথায়? নিবারণবাবু কোথায়?

এগিয়ে আসেন রায়বাহাদুর। বলেন, নিবারণবাবুর শরীর ভাল নয়, আপনার যা বলবার আমায় বলতে পারেন।

—আপনি কে জানতে পারি?

নিবারণবাবু আড়াল থেকে প্রকাশ করেন নিজেকে। বলেন, উনি রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী, এখন উনিই এ প্রেসের মালিক।

ধরণীবাবু আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখেন রায়বাহাদুরকে। চোখ দুটো বারকতক কুঞ্চিত আর প্রসারিত হয়। তারপর বলেন, ও, আপনিই নিলেমে এ প্রেস ডেকে নিয়েছেন! ভালো, ভালো, কিন্তু আপনার যে দমকা বড় লোকসান হয় যাবে দেখছি। কত··· ৭৫···না ৮০ হাজারে প্রেস ডেকে নিয়েছেন না?

—হ্যাঁ।

সকলেই অবাক হচ্ছে মনে মনে। কোথায় লুট হয়ে শোরগোল উঠবে, তা নয় ধরণীধর ঠাণ্ডা মেজাজে এ সব কি বলতে শুরু করলে?

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে ধরণীধর বললেন, এখন এটা বিশ হাজারে বিক্রী করতে হলে লোকসান একটু হচ্ছে বই কি ?

—বিশ হাজারে আমি বিক্রী করব কেন ?

—আজ্ঞে তা করতে হবে বই কি। ধরণীধর চৌধুরী একবার যখন দর দিয়েছে তখন তার কথার নড়চড় হয় না।

ওপর থেকে বোঝা যায় না। জলে নামলে বোঝা যায় ভেতর থেকে চোরা স্রোত ধ্বসিয়ে দিচ্ছে তলার মাটি ! রায়বাহাদুর সমান তাল রেখে বলেন, নড়চড় আমার কথারও হয় না। আমি কাউকে বিক্রী করব না। বিশ হাজার ত বিশ হাজার—লাখ টাকাতেও নয়।

ধরণীধর বাঁকা হাসি হাসলেন। বলেন—আস্তে রায়বাহাদুর হঠাৎ অত গরম হয়ে উঠবেন না। বিক্রী আপনাকে বিশ হাজারেই করতে হবে—আর এক্ষুনি ! এই সব কাগজপত্র ঠিক করা আছে, একটু দয়া করে সই করুন দেখি। পকেট থেকে পিন আঁটা কয়েকখানা কাগজ বের করে মেলে ধরেন ধরণীধর। রায়বাহাদুর চেয়ে দেখেন না কাগজ-গুলোর দিকে। অন্য দিকে চেয়ে বলেন, সই আমি করব না।

সই না করলে এই বিশ হাজার যা পাচ্ছেন তাও যে পাবেন না রায়বাহাদুর ; আমার এই সঙ্গী দুটিকে দেখছেন ত ! এই রকম অন্ততঃ গুটি পঞ্চাশ বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করে আছে। আজ রাত্রে বিক্রী না করলে কাল সকালে বিক্রী করবার মত এরা বোধ হয় আর কিছু রাখবে না। রাত্রি গভীর। পাড়া নিঃঝুম। ধরণীধরের প্রত্যেকটি শব্দ যেন পাথরের গায়ে খোদাই করার মত অন্ধকারের গায়ে গেঁথে গেঁথে যাচ্ছে।

পরমুহূর্তেই রায়বাহাদুরের অনুরূপ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—গুণ্ডার ভয় দেখিয়ে প্রেস কেড়ে নিতে চান ! আপনি যা পারেন করুন। এ প্রেস বিক্রী হবে না।

হঠাৎ বাইরে থেকে গণ্ডগোল ভেসে আসে। গলির মধ্যে একদল লোক যেন চেঁচামেচি মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে।

নিবারণবাবু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। কি ব্যাপার?

ধরণীধর হাসেন।—বোধ হয় আমার লোকেদের আর ধৈর্য সইছে না। নিন রায়বাহাদুর, সইটা এবার তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। বেশি দেরী হলে আমার লোকজনকে আর সামলে রাখা যাবে না মনে হচ্ছে।

জয়ন্ত বলে ওঠে, দরকার নেই তাদের সামলে। কাকাবাবু, সই করবেন না। নিবারণবাবু বলেন, গুণ্ডার জোরে যখন সব কিছুই নিতে এসেছেন তখন সামান্য সই-এ আপনার দরকারই বা কি ধরণীবাবু?

—না সই ওঁকে করতেই হবে, আপনি সই করবেন কি না বলুন?

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করে ছোটেলাল। সহজ সরল দেহাতী মানুষ। অনেক রাত্রির ঘর্ষণে যেন আরও কালো দেখাচ্ছে ছোটেলালকে। ছোটেলাল যেন খুশি হয়ে উঠেছে এমন ওর কথার ভঙ্গি। বলে, হাঁ, হাঁ, কেনো সই করবে না? জরুর করবে। লেন কাকাবাবু, একটা দস্তখৎ করিয়ে দেন। ব্যস্।—তুমি, তুমিও তাই বলছ ছোটেলাল? রায়বাহাদুর যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না!

—হাঁ, হাঁ, হামিও বোলছি দস্তখৎ না কোরে উপায় কি আছে!

—বেশ তাই আমি করছি। সকলের বিস্মিত ও নির্বাক দৃষ্টির মাঝখানে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন রায়বাহাদুর। সই করে দেন কাগজখানায়। হাত বাড়িয়ে কাগজটা ফেরৎ নিচ্ছিলেন ধরণীধর, মাঝপথে ছোটেলাল ছিনিয়ে নেয়। আরে, দাঁড়ান মোশাই দাঁড়ান! ধরণীধর কিছু বলবার আগেই ছোটেলাল কাগজটা কুচি কুচি করে কুচিয়ে ছড়িয়ে দেয় ধরণীধরের মুখের ওপর। বলে, এই নিন আপনার দলিল।

ধরণীধর যেন বলতে চেষ্টা করছিলেন—এত বড় আস্পর্ধা....কিন্তু বাইরের এক তুমুল কোলাহলে তাঁর কথা শোনা গেল না। প্রেস-বাড়ির উঠোন তখন মানুষে ভরে গেছে। রিক্সাওয়ালা...ফেরীওয়ালা, ...ট্যাক্সিওয়ালা ...প্রেস-কর্মচারী—কেবল লোক আর লোক। নিরস্ত্র কিন্তু ধারালো তাদের দাবী—ধরণীধরের মাথা চাই—।

কয়েক পা পিছিয়ে আসেন ধরণীধর।—এ সবের মানে!

—মানে সমঝাতে পারছেন না? হাসতে হাসতে অমায়িকভাবে বলে ছোটেলাল, দুনিয়ামে গুণ্ডা বদমাস ভি আছে, আউর সিধা ভালা আদমি ভি আছে। এই সিধা ভালা আদমি যেখোন ক্ষেপে যায়, তখন গুণ্ডা বদমাস তুফানকে আগে শুখ্যা পত্তাকি মাফিক উড়ে যায়!

—বাগে পেয়ে তোমরা আমার ওপর জুলুম করতে চাও? হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলেন ধরণীধর।

—এ বিদ্যে ত আপনার কাছে শেখা ধরণীবাবু।—জয়ন্ত বলে পেছন থেকে।

—তবে ভয় নেই।—আশ্বাস দেন নিবারণবাবু। ছোটেলালকে ডেকে বলেন, একটা যাহোক ব্যবস্থা কর ছোটেলাল। ওরা যে রকম ক্ষেপে আছে, বলা ত যায় না, ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে আমাদেরই যে বদনাম!—নিবারণবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কি করে যে সামলাবেন ওদেরকে।

ছোটেলাল আগের মতই নির্বিকার হয়ে বলে—হাঁ, হাঁ, ওহি ভি ত শোচতে আছে। একটা শাড়ি আনিয়ে দেন ত দিদিমণি!

—শাড়ি? শাড়ি? সকলের বিস্মিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। শাড়ি দিয়ে কি হবে?

—হাঁ, হাঁ, একটা ভালো শাড়ি! জলদি লিয়ে আসেন।

—প্রণতি শাড়ি আনলে বোঝা যায় ছোটেলালের মতলবটা কি। ঐ শাড়ি ধরণীধরকে পরিয়ে বের করে দেবে ভীড়ের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া নাকি ধরণীধরের জান মান বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই!

অগত্যা শাড়ি পরেই বেরিয়ে এলেন ধরণীধর। আগে আগে চলেছে ছোটেলাল। ছোটেলালের দলের একজন সন্দেহ করে। বলে, আরে এ কোন হ্যায় ভেইয়া?

—মেরা জরু হ্যায় ভেইয়া। আমার ইস্ত্রি আছে। অম্লানবদনে

বলে ছোটেলাল। ভীড় পেরিয়ে এনে ধরণীধরের কানে কানে বলে —যাও, আজ হামার ইস্তিরি হোয়ে খুব বাঁচিয়ে গেলে। লেকিন এইসা লাগচ্ কভি কর্ না! আর কোনদিন এ রাস্তায় দেখি চি ত ইস্তিরি ফিস্তিরি মানবে না! একেবারে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। যাও, তেরা ভালা হো! ধরণীধর কথাটি বলেন না। একান্ত বাধ্য স্ত্রীটির মত ছোটেলালকে অনুসরণ করেন। তা না হলে জান মান বাচাবার কোনও উপায়ও নাকি নেই। গুণ্ডার দলকে ইতিমধ্যেই এরা মারধর করে পার করে দিয়েছে!

প্রশংসমান দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়ে থাকে ছোটেলালের দিকে। হাতের লাঠিটার মতই সহজ সরল দেহাতী ছোটেলাল!

ঝড়-তুফান শেষে ভরা নদী তার শীতল বিস্তার মেলে ধরেছে দূরে দূরে। এখন শুধু নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে তরী বেয়ে চলা। পালে নতুন হাওয়া লাগছে। জয়ন্ত দেখছে তার পাশে এমন এক শীতল নদীর পরিবেশ। কিন্তু জলের বিস্তার এত বেশি যে এপার-ওপার দেখা যায় না। কূলের কোন চিহ্ন নেই। ঠিক পারের দিকে নিয়ে যাবে তরী—এমন নাবিক কই? এলোমেলো আর যে বাইবে না, এমন নাবিক কই? কতদিনের স্বপ্ন তার একটা প্রেস হবে, সেখান থেকে কাগজ বেরুবে। তার কলমের ইশারায় যে সৈনিকরা ওঠে-বসে সেই কালো কালো আঁচড়ের মত অজস্র সৈনিক যে যন্ত্র-বলে হাজারে হাজারে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে, ছড়িয়ে পড়ে বহু লোকের হাতে, বহু দেশে, সেই যন্ত্র পাবার একটা সাধ ছিল জয়ন্তর। সেই যন্ত্র আজ হাতে এসে গেছে। অত বড় নবজীবন প্রেস কিনে নিয়েছেন, আর কেউ নয় তার কাকাবাবু স্বয়ং। কিন্তু এ প্রেসকে যেন আপন করতে পারছে না জয়ন্ত। কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেল। ঝড় থামতে হারিয়ে গেল কূল। তাই ত আজ নাবিকের খোঁজ পড়েছে, যে পথ চিনিয়ে দেবে।

কতগুলো কাণ্ড ঘটে গেল এক সাথেই, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এল জয়ন্ত। যে ছিল অজানা, অচেনা, সে নিতান্ত আপনার হয়ে উঠল, তাকে ভরসা করে আর একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন নিবারণবাবু। কিন্তু সেই ভরসাস্থল ভাঙল, ধ্বসে গেল চোরাবালির মত। এল বান! সেই বানে দেখা গেল যাকে চোরাবালি মনে হয়েছিল তাকেই আজ পাওয়া যাচ্ছে সবুজ চরের মত। সেই ত কূল! নিবারণবাবু ভাবেন আর চোখ বোজেন। এতবড় বিস্ময় যে চোখ মেলে চাইতে ভরসা হয় না! এই শেষ বয়সে একি শুরু হল জীবনে? এ কী এল!

প্রণতি একটা স্বপ্ন দেখছে। অনেক দিনের পুরনো স্বপ্নটা, আজ নতুন করে দেখছে, একটু নতুন ঢঙে। স্বপ্ন দেখতো প্রণতি, একদিন তার বাবা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, কর্মক্ষমতা আসবে কমে, তখন প্রণতি একাই 'নতুন খবর'কে নবজীবন প্রেসকে—গুরুভার হলেও মাথায় তুলে নেবে। সেই গুরুভার বহনের বিহ্বলতায় রোমাঞ্চ হত প্রণতির। ওর সেই নিঃসঙ্গ দায়িত্বের কথা ভাবতে ওর কেমন ভয়-মিশ্রিত গর্ববোধ জাগত আজ আবার সেই স্বপ্ন দেখছে প্রণতি। দেখছে একটু নতুন ঢঙে! খুব একা মনে হচ্ছে না আজকে। কার যেন ছায়া পড়েছে একটা! কোথায় যেন আলো জ্বলে উঠেছে। তাই দেখা যাচ্ছে ছায়াকে। এ ছায়া কি তার নিজের নয়? অন্য কারও? সে ছায়া টানছে আজ বড় বেশি। ছায়াকে ধরবার পণ সে ত কখনও করে নি! এখন কি করবে? এমনই একটা দ্বন্দ্বের মধুর স্বপ্ন দেখছে প্রণতি!

প্রেসটা নিয়ে ভবিষ্যতে কি হবে, তাই নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠক হচ্ছিল। রায়বাহাদুর বলে দিয়েছেন যে প্রেস তিনি কিনেছেন বটে, কিন্তু ও-সব দেখবার তাঁর সময় নেই। ওটা নিবারণবাবুরই দেখা উচিত।

কিন্তু নিবারণবাবু স্থবির, বিশেষতঃ সেদিনকার আঘাতে পঙ্গু। নিবারণবাবু বলছেন, ওটা রায়বাহাদুরেরই থাক।

জয়ন্ত বলে, কাকাবাবুর একটু মুস্কিল আছে। কাগজে কখন কি বেয়াড়া লেখা বেরিয়ে পড়বে, তখন কাকাবাবুর খেতাব নিয়ে টানাটানি। কাকাবাবু রেগে উঠেছেন।—খেতাব! রায়বাহাদুর! ঝকমারি হয়েছে আমার এই খেতাব নিয়ে! কালই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এ খেতাব ছেড়ে দেব।···কিন্তু এ প্রেস-ট্রেসের ব্যাপারে আমি নেই বলে দিচ্ছি।

জয়ন্ত বলে, আপনার প্রেস আপনি না থাকলে চলবে কেন?

—আলবৎ চলবে। একশো বার চলবে। এ প্রেস আমি তোমার নামে আজই লিখে দিচ্ছি। তুমি দয়া করে আমায় রেহাই দাও।

—সে আমি পারব না। নিজের প্রেস, নিজের কাগজ হলে আমার মেজাজই বিগড়ে যাবে। কখন কি হয় ভেবে ভেবে জোর করে লিখতে পারব না।

কথাটা এলোমেলো শোনায় জয়ন্তর মুখে। যেন ওর মনের কথা নয়। তাই কথাটা শেষ করেই জয়ন্ত অন্যদিকে চেয়ে চুপ হয়ে যায় একেবারে। জলভরা নদীর বুকে কূল দেখা যায় না। নাবিক চাই।

ছোটেলাল বলে, ওটা প্রণতি দিদিমণিকেই দিয়ে দেওয়া ভাল। প্রণতি দিদিমণির হাতে গড়া কাগজ অন্যের হাতে যাবে কেন?

রায়বাহাদুর উৎসাহিত হতে ওঠেন, তুমি নেবে মা? সত্যি তুমি এ ভার নেবে? আশ্চর্য! প্রণতিই যেন তাদের মধ্যে একজন, যে ভার নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। নিঃসঙ্গ দায়িত্বের স্বপ্ন দেখে আসছে প্রণতি। আজকের সামান্য নতুন ঢঙ তাকে খুব বেশি বিচলিত করে নি বোধ হয়। প্রণতি বলে, কেন নেব না কাকাবাবু! আমাদের মেজাজ ত এত পলকা নয় যে একটুকুতেই বিগড়ে যায়!

চেষ্টা করেও জয়ন্ত প্রণতির দিকে না তাকিয়ে পারে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে ওর। প্রণতির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে

উঠে যায় জয়ন্ত। বলে যায়—বেশ, তাহলে ত ব্যবস্থা হয়েই গেল! আমার আর এখানে থাকবার দরকার কি?

প্রণতি হাসছিল কথাটা শেষ করে, আরও হাসছিল জয়ন্ত ওর দিকে ঠিক তাকিয়েছে বলে। কিন্তু জয়ন্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, সকলের চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে গেল। জয়ন্ত চলে যাচ্ছে দেখে কাকাবাবুও উঠছিলেন, প্রণতি বললে. দাঁড়ান. আপনি উঠবেন না কাকাবাবু, আমি দেখছি। প্রণতি উঠল দেখে ওরা যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

লঘু পদে বেরিয়ে আসছিল জয়ন্ত, যেন চলেও সে চলছে না। দরজার কাছে এসে দেখল পথরোধ করতে আগেই এসেছে প্রণতি, হাতে একখানা নোটিস। এ নোটিস দেখেছিল জয়ন্ত যেদিন প্রথম ভীড় দেখে ঢুকেছিল এই প্রেসের জমিতে। সে নোটিসে লেখা 'কম্পোজিটর চাই!'

প্রথমটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল জয়ন্ত, তারপর হেসে ফেলল।—কি ব্যাপার কি? আমি কি কম্পোজিটরের উমেদার নাকি?

—একদিন ত ছিলেন! মুখ ঢেকে হাসল প্রণতি!

জয়ন্ত আরও হাসল।—সেবার যা শিক্ষা হয়েছে, তাতে আর ও-রাস্তা মাড়াই! ষোল এম্ ডবল কলম শুনলে এখনও বুক ধড়পড় করে।

—কম্পোজিটরী ছাড়া আমাদের প্রেসে অন্য চাকরিও ত খালি আছে!

—আছে না কি? কী চাকরী শুনি! জয়ন্ত রীতিমত উৎসুক হয়ে ওঠে। চলে না আর, দাঁড়ায়।

—এই যেমন ভাল একজন সম্পাদক আমাদের দরকার!

জয়ন্ত হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়াতে বড় কাছে এসে গিয়েছিল প্রণতি। কিন্তু জয়ন্ত সে বিষয়ে সচেতন থেকেই বলে চলে, সম্পাদক! কিন্তু সম্পাদকের যদি বানান ভুল হয়?

—তা না হয় শুধরে দেওয়া যাবে।

—শুধরে দেবে। কিন্তু দু'চারদিন শোধরালে ত চলবে না। চিরকাল শোধরাতে পারবে। বল পারবে চিরকালের ভার নিতে।

এক নিঃসঙ্গ দায়িত্বকে স্বপ্ন দিয়ে লালন করে এসেছে প্রণতি। আর এই ভার সে কি বইতে পারবে?

—চিরকালের ভার নিতে হবে। চিন্তিত মুখে প্রশ্নটা করে প্রণতি, তারপরেই দুষ্টুমি করে বলে ওঠে, বয়ে গেছে।

—ভার তাহলে নিতে পারবে না।

—আচ্ছা নেব। তাড়াতাড়ি স্বীকার করে নেয় প্রণতি। সময় তার বড় অল্প। একটু থেমে বলে, চিকিৎসা তাহলে আজ থেকেই শুরু।

—চিকিৎসা। রীতিমত অবাক হয় জয়ন্ত।

—হ্যাঁ, ভুল শোধরাবার চিকিৎসা। বানান কর দেখি—মুহূর্ত।

এক মুহূর্তে জয়ন্তর কাছে সব যেন স্পষ্ট হয়ে আসে। দুষ্টুমীর পালা এবার ওর। বলে—মুহূর্ত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুহূর্ত! খুব একটা জব্দ করবে ওকে, এমন ভাব প্রণতির মুখে।

—প এ র ফলা মূর্ধণ—ত-এ হ্রস্বই!

—অ্যাঁ? এই তোমার বানান হল? চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে প্রণতির।

—হল ত। ও ছাড়া আর কোন বানান যে মাথায় নেই! মুখে মুখে জবাবটা দিলেও সমস্ত মন দিয়ে জয়ন্ত শুধু দেখছিল প্রণতির রাঙা মুখখানা। জয়ন্তর মনে হল ওটা যেন কোন রাঙা আলোর ছটা।···

যে আলো নাবিকের হাতে, কূল-হারা ভরা-নদীর বুকে।